২২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

আনন্দমেলা

বিশেষ বড়দিন সংখ্যা

■ শুরু হল বিমল করের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস: মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

■ রঙিন পোস্টার : হিরো কাপজয়ী অধিনায়ক আজহারউদ্দিন

■ বর্ষসেরা খেলা ও খেলোয়াড়

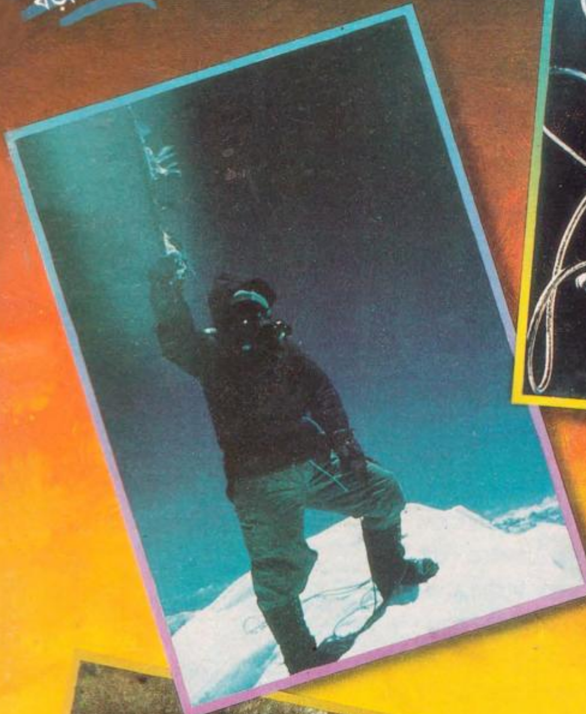

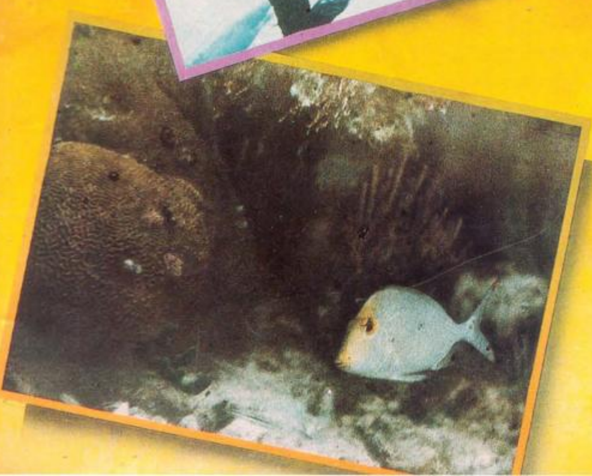

প্রথম ফোটোগ্রাফ

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ফোটোগ্রাফ । এভারেস্ট-শৃঙ্গ, সমুদ্রতল, মহাকাশে পায়চারি, রামধনু ও সূর্যাস্ত, ব্যারিকেড ও গিলোটিন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং এ-ধরনের আরও নানা বিষয়ের বিস্ময়কর প্রথম ফোটোগ্রাফ সঙ্কলন করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

তিন পরিষ্কার বিজয়ীর সমাহার ভিডিওকোন

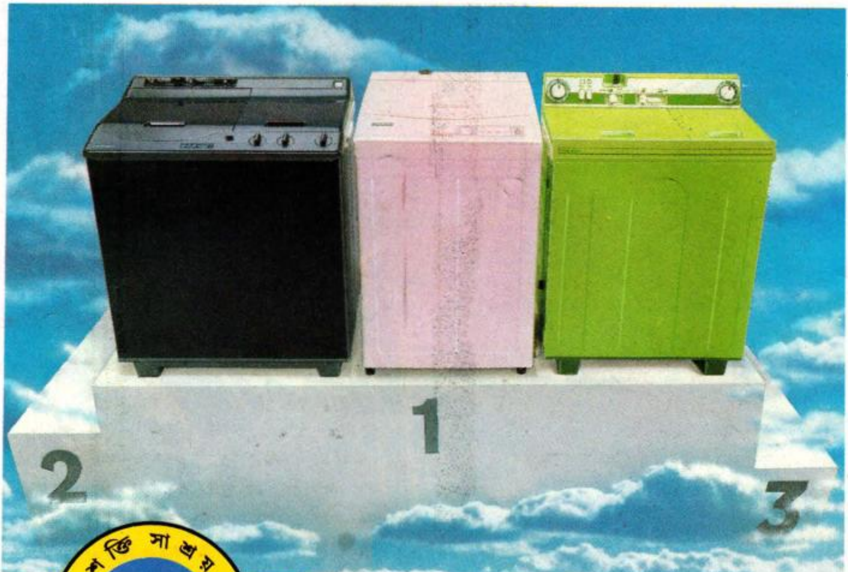

শক্তি সাশ্রয়
২ বছরের ওয়ার‍্যান্টি
জল সাশ্রয়

ভিডিওকোনই সর্বপ্রথম ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী ডিজাইনের ওয়াশিং মেশিন বাজারে দিয়েছিল । আর এটাই এখনও সবচেয়ে বেশি বিক্রীত মেশিন। আজ, সেই ভিডিওকোন তুলে ধরছে এক অপরাজেয় শ্রেণীর ওয়াশিং মেশিন, যা সকল সম্ভাব্য প্রয়োজনের উপযোগী। এদের বৈশিষ্ট্য সর্বাধুনিক জাপানী প্রযুক্তি এবং সেরা গুণমান বজায় রেখে নির্মাণ। **ন্যাশনাল** ব্র্যাণ্ড নামের সত্ত্বাধিকারী **মৎসুশিটা ইলেকট্রিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোং, জাপান**-এর কারিগরী সহযোগিতায় নির্মিত। এই মেশিনগুলোর মধ্যে একটিই হবে আপনার পক্ষে সঠিক নির্বাচন।

ভি-এনএ-৪০০টি
বৃহত্তম সেমি-অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন।

- ৪.৯ কিলো ধারণক্ষমতা বা ২২টি পোষাক।
- সম্পূর্ণ ও মোলায়েম ধোলাইর জন্য বিগ-U কনকেভ পালসেটর।
- অভিনব স্পিন-শাওয়ারের সুবিধে।
- ধোলাই সম্পূর্ণ হবার নির্দেশক ঘন্টা (বাজার)।
- অতি-চকচকে পাউডার প্রলেপের মিহি ফিনিশ এবং আঁটোসাঁটো বডি ডিজাইন।

ভি-এনএ-৮১১ টেকনো-ক্লীন
সর্বাধুনিক জাপানী প্রযুক্তিনির্ভর ভারতের প্রথম প্রোগ্রামযোগ্য ওয়াশিং মেশিন।

- ব্যবহার সহজ, মোলায়েম পরশের মাইক্রো-কমপিউটার নিয়ন্ত্রকসমূহ।
- ১৮টি ওয়াশ প্রোগ্রাম থেকে চয়নের সুযোগ।
- ৪ কিলো ধারণক্ষমতা বা ১৮টি পোষাক।
- সুপার-ফ্লো অ্যাকশনের পালসেটর কারিগরীবিদ্যা। নিশ্চিত রাখে এক সম্পূর্ণ অথচ মোলায়েম ধোলাই।
- গরম জলের প্রয়োজন নেই। ৫০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়।

ভি-এনএ-২০০টি
ভারতের জনপ্রিয় সেমি-অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন

- ৩ কিলো ধারণক্ষমতা বা ১২টি পোষাক।
- মজবুত, সুদৃঢ়, বিশেষভাবে ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী ডিজাইন।
- অভিনব স্পিন শাওয়ারের সুবিধে।

ভি ডি ও কো ন

৬ পৌষ ১৪০০ ❑ ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ❑ ১৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

বিশেষ বড়দিন সংখ্যা

প্রচ্ছদকাহিনী
প্রথম ফোটোগ্রাফ সঙ্কলন : সিদ্ধার্থ ঘোষ ১২
ধারাবাহিক উপন্যাস
মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না বিমল কর ৬
শিউলি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭৫
কল্পবিজ্ঞানের গল্প
কনিষ্ক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ৫৭
গোয়েন্দা গল্প
ওহায়ওতে একেনবাবু সুজন দাশগুপ্ত ৬৫
কমিক্স
অরণ্যদেব ৩১, আর্চি ৫৩, গোয়েন্দা শার্লক হোম্স ৬৯, টিনটিন ৭১, গাবলু ৭৩, টারজান ৭৪
চিকিৎসাবিজ্ঞান
আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিকল্প চিকিৎসা
বিমল বসু ৫৫
কেরিয়ার গাইড
ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে জয়েন্ট এনট্রান্স
অমর দাশ ৭৮
খেলাধুলো
বর্ষসেরা খেলা ও খেলোয়াড় তানাজি সেনগুপ্ত ৪৩
টেনিসে যাঁরা উঠে আসছেন প্রতাপ জানা ৪৭
খেলার খবর ৫০
রঙিন পোস্টার : হিরো কাপ-জয়ী অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন ৪১
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৪, ইতিহাস ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, আঁকিবুকি ৫৮, হাসিখুশি ৫৮, কুইজ ৬২, শব্দসন্ধান ৭৬, ক্যাম্পাস ৮০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

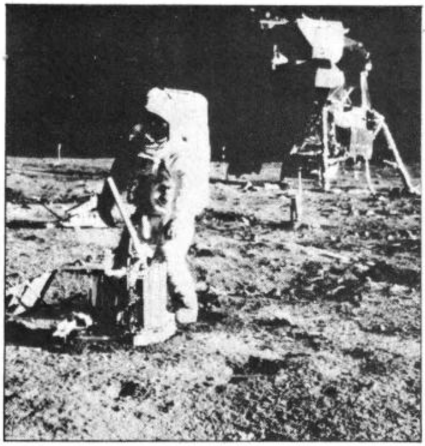

ফোটোগ্রাফের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে প্রথম ফোটোগ্রাফের। এভারেস্ট-শৃঙ্গে তেনজিং নোরগের প্রথম ফোটো, কিংবা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম ফোটো এবং এ-ধরনের অজস্র প্রথম ফোটোগ্রাফ সঙ্কলন করা হল এই সংখ্যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ফোটোগ্রাফিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে শক্তিশালী নানা ধরনের ক্যামেরা। তবু অতিসাধারণ ক্যামেরায় এমন সব ঐতিহাসিক মুহূর্তের ফোটো তোলা হয়েছে, যা এখনও আমাদের অবাক করে। চিরদিনের দলিল এইসব ফোটোগ্রাফ। এই সঙ্কলনে এরকমই বেশ কিছু ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করা হল, সংগ্রাহকদের কাছে তার মূল্য কম নয়।

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী

স্কুলে ভর্তির জরুরি খবর

নতুন বছরে বিখ্যাত স্কুলে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। অভিভাবকরাও চিন্তায় থাকেন। তাঁরা চান এমন স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে, যেখানে তারা নিশ্চিন্ত মনে কেরিয়ার গড়তে পারবে। 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় গত কয়েক বছর ধরে স্কুলে ভর্তির নানা খোঁজখবর প্রকাশ করা হচ্ছে। আগামী সংখ্যাতেও দেওয়া হচ্ছে ৩০টিরও বেশি স্কুলে ভর্তির খোঁজখবর।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প

নতুন করে আর কী হবে

কুইজ, কমিক্স ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

কাউকেন ও চক্রবাক

আনন্দমেলা ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় 'কাউকেনরা আর ডিম পাড়বে না' পড়ে খুব ভাল লেগেছে। এখানে কাউকেন পাখিদের যে আলোকচিত্র ও বিবরণ লেখক দিয়েছেন এবং তাদের পরিবেশের সঙ্গে জীবনযাত্রার যে আভাস দিয়েছেন, তাতে আমাদের এই বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি চক্রবাকের (চখা-চখি) বেশ মিল আছে। এই প্রসঙ্গে ২০ বছর আগের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। রাজমহল গঙ্গায় এক শীতের সকালে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'ফেদার গেম্স'-এ গিয়েছিলাম। সেখানে বন্দুকের গুলিতে একটা চক্রবাক আহত হয় ; কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, আর-একটি চক্রবাক ক্রমান্বয়ে তার আহত সঙ্গীর ওপরে উড়েই চলেছে। আমরা এই ঘটনায় বেদনাভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

অরুণপ্রকাশ মণ্ডল
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
সুমন মজুমদার
ষষ্ঠ শ্রেণী,
সেন্ট জোসেফ অ্যান্ড মেরিজ স্কুল

'কাউকেনরা আর ডিম পাড়বে না' লেখাটি ভারী সুন্দর হয়েছে। অনেক ভ্রমণকাহিনী পড়েছি, তবে এই লেখাটি অসাধারণ। সত্যি, আমরা কত নিষ্ঠুর। নিজের সাময়িক সুখের জন্য আমরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষও প্রাণীদের কী চরম দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় কিছু প্রাণীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে যেন মানুষের লোভের শেষ নেই। লেখক তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন লেখাটিতে।

শমিত দাস
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০
অনির্বাণ দত্ত
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

নতুন শহরের পাশাপাশি পুরনো শহরের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য

প্রচ্ছদকাহিনী 'বিখ্যাত শহর' (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) পড়ে খুব ভাল লাগল। এরকম প্রচ্ছদকাহিনীর অপেক্ষায় ছিলাম অনেকদিন। ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা জুড়ে লন্ডন শহরের ছবিটি ভারী সুন্দর। টেমস্ নদীর দু'পাশে লন্ডন যেন এক স্বপ্নের শহর। এই প্রচ্ছদকাহিনীতে লন্ডন ছাড়াও আরও অনেক শহরের কথা আছে। কিন্তু প্যারিসে সোন নদীর ওপর ৩০টা সেতু দিয়ে শহরটাকে আরও সুন্দর করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপের এক একটা বড় বাড়িকে এক-একটা ছোট শহর বলা হয়। গগনচুম্বী এই বাড়িগুলিকে বলা হয় 'স্কাই স্ক্রেপার'। এরকম এক-একটি বাড়ির লোকসংখ্যা ১০ থেকে ১৫ হাজার। বাড়িতেই ডাকঘর, টেলিগ্রাম অফিস, দোকান আছে। বার্লিন শহর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চিনের বেজিং শহরে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সাইকেল চলে। এই তথ্যগুলি প্রচ্ছদকাহিনীতে উল্লেখ করলে ভাল হত। রাইন নদীর তীরে যত সুন্দর শহর দেখা যায়, পৃথিবীতে আর কোনও নদীর তীরে তত সুন্দর শহর দেখা যায় না। ইউরোপের বিখ্যাত ভিয়েনা ও হামারফাস্ট শহরের কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা। এত ছোট দেশের এত বড় রাজধানী সত্যিই বিস্ময়কর। অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই এই শহরে বাস করে। এই শহরের সঙ্গে ইউরোপের প্রধান-প্রধান শহরের রেল যোগাযোগ আছে। তাই একে ইউরোপ মহাদেশের স্বাভাবিক রাজধানী বলা হয়। নরওয়ের হামারফাস্ট শহরে মাঝরাতে সূর্য দেখা যায়। এ এক বিস্ময়! এসব কথা প্রচ্ছদকাহিনীতে না থাকলেও, প্রচ্ছদকাহিনীটি সত্যিই সুন্দর হয়েছে। পুরনো শহরের ইতিহাসও বেশ উল্লেখযোগ্য। নতুন শহরের পাশাপাশি পুরনো শহরের কথা প্রকাশ করে আপনারা শহর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের পরিকল্পনা সত্যিই প্রশংসনীয়।

দেবদত্ত ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণী
বিলবং হাই স্কুল
বিলবং, শিলং

ওয়াশিংটন শহর

তৃষ্ণার্ত গাছ

১৫ সেপ্টেম্বরের আনন্দমেলার প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগে বিমল বসুর লেখা 'তৃষ্ণার্ত গাছেরা কাঁদে নিঃশব্দে' অত্যন্ত ভাল লাগল। বিমল বসু গাছ সমন্ধে যে নানান অজানা তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা সত্যিই আমাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ করে আমাদের মতো বিজ্ঞান-ক্লাবের সদস্যদের কাছে অত্যন্ত উপকারী। তিনি যে তথ্যটি দিয়েছেন— "গাছ প্রেরিত বিপদ সঙ্কেতের তরঙ্গ, যার কম্পাঙ্ক ৫০ থেকে ৫০০ কিলোহার্জ"— আমার মনে হয় এ-বিষয়টিও অনেকের কাছেই অজানা। এ-ধরনের তথ্য আমি সাম্প্রতিক কোনও বিজ্ঞান পত্রিকায়ও পাইনি। আগামী দিনে এ-ধরনের তথ্যপূর্ণ লেখার প্রত্যাশায় থাকলাম।

দেবাশিস পাল
একলব্য সায়েন্স ক্লাব,
ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা (উঃ)

ডেভিস কাপ

১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'খেলাধুলো' বিভাগে ডেভিস কাপ নিয়ে লেখা খুব ভাল হয়েছে। 'ডেভিস কাপ ফাইনালে যাচ্ছে ভারত, নরেশকুমার আশাবাদী' লেখায় তানাজি সেনগুপ্ত লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়া ২০ বারের ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু এই তথ্যটি ঠিক নয়। অস্ট্রেলিয়া ২৬ বারের চ্যাম্পিয়ান।

মহম্মদ নাসিমুল হক
মাঠপলসা, বীরভূম

বডিবিল্ডার

আনন্দমেলায় প্রকাশিত খেলোয়াড়দের রঙিন পোস্টার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা যদি প্রতি সংখ্যায় খেলোয়াড়দের পোস্টারের সঙ্গে, নিয়মিতভাবে, কোনও একজন করে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বডিবিল্ডারের পোস্টারও ছাপেন, তা হলে আমার মতো স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু বহু কিশোর-কিশোরী সেই পোস্টার থেকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবে।

নীলাঞ্জন চক্রবর্তী
দমদম, কলকাতা-৫০

ইতিহাস

গাছপালা, পশুপাখি এবং অশোক

সাঁচিস্তূপের ভাস্কর্যে বৃক্ষপ্রেমিক সম্রাট অশোক

অশোকের রান্নাঘরে এখন দুটো ময়ূর আর একটা হরিণ। কেটে-ছেঁটে তৈরি করা হবে মাংসের তরকারি। তাও আবার হরিণের মাংস রান্না হয় না নিয়মিত। এর পর থেকে অবশ্য এইসব প্রাণী আর হত্যা করা হবে না—সম্রাটের নির্দেশ। আগে তো এই রন্ধনগৃহে বলি দিয়ে আনা হত শত-সহস্র প্রাণী। আর নয়! এইসব কথা প্রিয়দর্শী অশোক তাঁর প্রথম গিরি অনুশাসনে নিজেই লিখে জানিয়েছিলেন সবাইকে। ২৫৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। রাজ্যাভিষেকের প্রায় দশ-এগারো বছর পরে।

তারপর আবার ২৬ বছরের মাথায় ২৩ রকমের পশুপাখি অবধ্য বলে তিনি ঘোষণা করলেন। এদের কয়েকটির নাম : শুক, সারি, চখা, হাঁস, জলতিতির, বাদুড়, আমগাছের পিঁপড়ে, কচ্ছপ, কাঁটাহীন মাছ, সাঁকোচ মাছ, গাঙচিল, শজারু, খরগোশ, কাঠবেড়ালি, হরিণ, গণ্ডার, ষাঁড়, গৃহপালিত পশু, সাদা পায়রা, ঘুঘু ইত্যাদি। নিষিদ্ধ করে দিলেন দুগ্ধবতী কোনও প্রাণিহত্যা।

এমনকী তুষধানের মধ্যে কোনও পোকামাকড় থাকলে তাদেরও পুড়িয়ে মারা চলবে না। চলবে না জঙ্গলে আগুন জ্বেলে বুনো পশুকে তাড়িয়ে এনে হত্যা করা।

প্রথমে নিজের ঘরে পশুহত্যা বন্ধ করে, পরে সারা রাজ্যের লোককে পশুপাখির ওপর অত্যাচার না করতে বলে সম্রাট অশোক সেদিন প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথাই বললেন প্রকারান্তরে।

কেউ-কেউ বলবেন, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সম্রাট নিরামিষ খেতেন বলে সবাইকে তাঁর দলে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পশুদের চিকিৎসার জন্য পিঁজরাপোল করে দিচ্ছেন বলে তাঁর এক শিলালিপিতে জানালেন, তখন কি খাটে সেসব কথা! পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে প্রিয়দর্শী যে অবধ্য পশুপাখির তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল মানুষের অখাদ্য। যেমন, গণ্ডার, বারাশিঙ্গা হরিণ। তবু তাদের উল্লেখ করে অশোক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এদের মেরে ফেললে একদিন এদের প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের লেখকেরা ময়ূর ভক্ষণ নিষিদ্ধ করলেও আগেই বলেছি, অশোকের রান্নাঘরে ময়ূরের মাংস রান্নার প্রচলন ছিল এককালে। সম্রাট তাও বন্ধ করে দেন।

পশুপাখির কথা থাক। গাছপালার কেমন পরিচর্যা করতেন অশোক, সে-কথা এবার শোনা যাক তাঁর নিজের মুখ থেকেই। দ্বিতীয় গিরিশাসনে তিনি জানাচ্ছেন,'যেখানে যেসব গাছ, ফলমূল নেই সেখানে আমি তা অন্য জায়গা থেকে এনে লাগিয়েছি। পথের ধারে বৃক্ষরোপণ করিয়েছি। পশু ও মানুষের চিকিৎসার কাজে যেসব ভেষজ ওষধি লাগে, তাও এনে লাগানো হয়েছে যেখানে নেই সেখানকার মাটিতে।' এইসব পড়ে তাঁর 'সায়েন্স অব লাইফ' বইয়ে এইচ. জি. ওয়েল্‌স লিখেছিলেন—একধরনের জল,মাটি,হাওয়া থেকে অন্যরকমের আবহে এই যে গাছপালার স্থানান্তরকরণ বা 'ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন', অশোক তার প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে পৃথিবীর উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসেও বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

মনে পড়ে গেল 'দিব্যাবদান'-এর এক গল্প। সম্রাটের এক দুষ্টু রানি বোধগয়ার সেই বোধিবৃক্ষটিকে জাদুবলে নষ্ট করে দিতে চাইছিলেন। রাজসভায় খবর এল, সেই মহীরূহটি মৃতপ্রায়। সে-কথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন অশোক। তাড়াতাড়ি ছুটলেন নিজে—গাছটিকে দেখতে, তার পরিচর্যা করতে। সঙ্গে গেলেন পাটরানি ও অনেক লোকলশকর। হাতির পিঠ থেকে নেমে অশোক শ্রদ্ধাসহকারে এগিয়ে গেলেন বোধিদ্রুমের কাছে। তারপর ঘড়া-ঘড়া সুগন্ধী জল ঢেলে স্নান করালেন। একসময় সবুজ পাতায় ভরে উঠল সেই ছায়াতরুটি। সাঁচিস্তূপের দক্ষিণ তোরণে বৃক্ষপ্রেমিক অশোকের সেই ছবিটি ধরা আছে।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

বিমল কর

আমার বড়দার নাম শিবনাথ।

নামের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের মিল বড় একটা থাকে না। বড়দার বেলায় ছিল। 'ছিল' বলছি এইজন্য যে, বড়দা এখনও আছে কিনা আমরা জানি না। জানলে হয়তো মনটাকে সইয়ে নেওয়া যেত।

দু' বছর আগে একদিন বড়দা হঠাৎ আমাদের লয়লাপুরের বাড়ি থেকে চলে যায়। কাউকে কিছু না জানিয়ে। নিরুদ্দেশ বলতে যা বোঝায় সেইরকম আর কী! অন্তর্ধানও বলা যায়।

মেজদা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে খবরটা জানাতে ভোলেনি। চিঠি পেতেই যা দু-তিনদিন দেরি হয়েছিল। তবে মেজদা লিখেছিল, "বড়দার কাণ্ডকারখানা তো তুই জানিস, এ তো নতুন নয়; দশ-পনেরোদিন পর আবার ফিরে আসবে বলে মনে হয় দাদা। তবু আমি জানাশোনা জায়গায় খবর নিচ্ছি। তুই ভাবিস না।"

বড়দার জন্য প্রথম দু-এক হপ্তা আমরা অতটা ভয়-ভাবনা করিনি। কেননা, আমাদের বড়দা আগেও দু'-চারবার এরকম কাণ্ড করেছে। হঠাৎ উধাও, আবার দশ-বিশদিনের মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসা।

এবার কিন্তু তা হল না। দু-এক হপ্তা থেকে দু-এক মাস, তারপর চার-ছ' মাস। শেষে বছর। বছর গড়িয়ে আবার বছর। দু' বছরেও বড়দার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমরা সবরকম চেষ্টা করেও একটুও খোঁজ পেলাম না দাদার।

একেবারে হালে, বড়দার অন্তর্ধানের ঠিক ছাব্বিশ মাস পরে আমার নামে একটা রেজিস্ট্রি-করা প্যাকেট এল। খুলে দেখি, একটা সাধারণ চটিমতন ডায়েরি খাতা আর একটি চিঠি।

চিঠিটি লিখেছেন মুকুলমনোহর ত্রিবেদী বলে এক ভদ্রলোক। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, তাঁদের ওদিককার এক ধর্মশালার পাঁড়েজি এই খাতাটা তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খাতায় যা-যা লেখা আছে তার বারোআনাই তিনি বোঝেননি। তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। যাই হোক ডায়েরি খাতায় একপাশে আমার নাম-ঠিকানা দেখতে পেয়ে তিনি খাতাটা আমায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই খাতার মালিক কি লেখক যে কে—তা উনি আন্দাজ করতে পারছেন না, তাঁকে কখনও দেখেছেন কি না তাও বলতে পারবেন না। নিজে তিনি বাস সার্ভিসের ডিপো ম্যানেজার। কত লোক আসে-যায় রোজ, কত লোককেই তো তিনি দেখেন। তার মধ্যে কে যে এই ডায়েরির মালিক, কে জানে! আরও অবাক কথা, ডায়েরি খাতায় নিজের নামের একটা ছোট সই থাকলেও পুরো নাম আর বাড়ির ঠিকানা লেখা নেই। নাম-ঠিকানা যা পাওয়া গেছে তা শেষের দিকের পাতার এককোণে, পেনসিলে লেখা। ওটা খাতার মালিকের হতে পারত—যদি ডায়েরির গোড়ার পাতায় ছোট করে লেখা সই আর শেষের দিকের লেখা নামের আদ্যক্ষর এক হত। দুটোই আলাদা। কাজেই তিনি যে নাম-ঠিকানা পেয়েছেন তার ওপর ভরসা করেই খাতাটা পাঠাচ্ছেন।

ত্রিবেদীজির অনুমান ঠিকই। বড়দার নাম শিবনাথ গুহমজুমদার। আমার নাম কৃপানাথ। মেজদার নাম বিশ্বনাথ। বড়দার সই ছিল এস. জি. এম. বলে। 'এস' অক্ষর আর 'কে' অক্ষরে অনেক তফাত।

ডায়েরি খাতাটা পেয়ে আমি যত অবাক, ভেতরের এলোমেলো আধখাপচা টুকরোটাকরা লেখা পড়ে তার চেয়েও বেশি হতভম্ব। বিহ্বল। ভয় ধরে গেল।

বড়দা কি তবে সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল? মাথার গোলমাল হয়েছিল দাদার? নয়তো এসব কী লিখেছে?

আমার বড়দার কথা এখানে একটু বলতে হয়। না বললে বুঝতে ভুল হতে পারে।

আমাদের বড়দা ছিল সরল সাদাসিধে মানুষ। একেবারে যেন ভোলানাথ। আত্মভোলা তো বটেই, বেশ খামখেয়ালিও। বড়দাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, মানুষটা একসময় এঞ্জিনিয়ারিংও পাশ করেছিল। বাবার মনে যাই থাকুক, বড়দাকে কখনও চাকরিবাকরি করাতে পারেননি। আমাদের মা নেই। কবেই চলে গিয়েছেন। বাবাও চলে গেলেন একদিন। বড়দাই থাকল মাথার ওপর। লয়লাপুরের যে-জায়গাটায় আমরা থাকতাম তার নাম ছিল রোসলপুর। ঘরবাড়ি, সামান্য জমিজায়গা, ফলমূলের ছোটখাটো বাগান আমাদের ছিল। বড়দা রোসলপুরের বাজারে একটা মনিহারি দোকান দিয়ে বসে থাকল। দোকানে সাধারণ ওষুধপত্র পাওয়া যেত। ওই দোকান আর বাড়ি নিয়েই দিন কেটে যেত দাদার। নিজে বিয়ে-থা করেনি। মেজদার বিয়ে-থা দিয়ে তাকে সংসারী করে বসিয়ে দিয়েছিল দাদা। মেজদা ডাক্তার। প্যাথলজিস্ট। কাছাকাছি এক ছোট হাসপাতালে চাকরি করে। বড়দা, মেজদা বাড়িতে। আমিই শুধু বাইরে। কলকাতায় থাকি। চাকরি করি ওষুধ কোম্পানিতে। ঘুরে বেড়াবার কাজই বেশি।

বড়দার সম্বন্ধে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি বরাবরই দেখেছি, ভুতুড়ে, অলৌকিক, অদ্ভুত ব্যাপার-ট্যাপার সম্পর্কে দাদার খুব ঝোঁক। মানে, এইসব বিচিত্র ঘটনার ওপর ওর ভীষণ টান। বাড়িতে বড়দার ঘরে হরেকরকম বই, কাগজপত্র, খবরের কাগজের কাটিং, ধুলোভরা উইয়ে-কাটা পুঁথিপত্রের মতন ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো বই যে কত—তার হিসেব কে করবে! দু-একটা বইয়ের নাম আমার মনে পড়ছে। যেমন, 'এ স্টেপ ইন দ্য ডার্ক', 'দ্য সিক্সথ সেন্স', 'আওয়ার হান্টেড প্ল্যানেট'। নামগুলো মনে পড়ছে—কেননা আমি দু-চারবার এইসব বই নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছি। একবর্ণও বুঝিনি। বইগুলো সবই বিদেশি; বিখ্যাত প্রকাশকদের ছাপা। কেউ যদি লেখক-প্রকাশকের নাম-ঠিকানা জানতে চায়—জানিয়ে দিতে পারি।

বড়দার কাছে এই বইগুলো যেন তার প্রাণ। মেজদা বলে, দাদার যত পাগলামি! যত্ত ভূত আর অদ্ভুত নিয়ে মাথা ঘামানো!

পাগলামি কিনা আমি জানি না। জগতে কতরকম কী ঘটে, আমরা তার এককণাও জানি কি! না জেনে কোনও কথা কেমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়!

তবে হ্যাঁ, বড়দার মধ্যে যে একটু-আধটু পাগলামি আছে—তা আমিও জানি। মানুষটা দোকান, বাড়ি, মেজদার ছেলেকে নিয়ে দিব্যি আছে। হঠাৎ একসময় উধাও। বাড়িতে বউদিকেও কিছু বলে যায় না। সাতদিন, দশদিন, বড়জোর পনেরোদিন—তারপর আবার ফিরে আসে। বড়দার অবর্তমানে দোকান সামলায় কচিদা, যার ভাল নাম কাঞ্চন। কর্মচারীও আছে একটা ছেলে, লাটুয়া।

বড়দার বয়েসের কথাটাও বলতে হয়। তা প্রায় পঞ্চাশ হল। পাকা শরীর-স্বাস্থ্য, মাথায় লম্বা, গায়ের রং ফরসা। মুখে দাড়িগোঁফ। মোটা খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু পরে না। একেবারে ষোলোআনা নিরামিশাষী। দুধ খেতে খুব ভালবাসে। আর জিলিপি। পঁচিশ-তিরিশটা গরম 'জিলাবি' বড়দা দশ মিনিটে শেষ করে দিতে পারে।

আমার এই বড়দার হঠাৎ অন্তর্ধান, দু' বছর একেবারে নিখোঁজ, তারপর একদিন আচমকা তার একটা ডায়েরি—যা কিনা এলোমেলো অস্পষ্ট কিছু লেখা বই কিছু নয়—আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছনো নিয়েই এই কাহিনী।

বড়দার ডায়েরি পড়ে আমি একেবারে হতভম্ব। আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

পাতা উলটে-উলটে বার কয়েক লেখাগুলো পড়লাম। বুঝতে পারলাম না। খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু 'নোট্‌স'।

যেটুকু বুঝলাম তা থেকে মনে হল: মন্দারগড় বলে একটা জায়গায় এমন এক আলো দেখা যায়—মাঝে-মাঝে—যা একেবারে জ্যোৎস্নার মতন। কৃষ্ণপক্ষেও দেখা যায়। শুক্লপক্ষেও। শুক্লপক্ষে চাঁদের আলো দেখা যাবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু শুক্লপক্ষের সব দিন তো ত্রয়োদশী, চতুর্দশী বা পূর্ণিমা নয় যে—সন্ধে না ঘনাতেই জ্যোৎস্না এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বচরাচর।

বড়দা যে জ্যোৎস্না বা আলোর কথা লিখেছে তা কিন্তু পক্ষ মানে না, তিথি মানে না; নিজের মরজি মতন সে দেখা দেয়—আবার মিলিয়েও যায়।

ব্যাপারটা বিচিত্র বইকী !

দুটো দিন ওই ডায়েরি নিয়ে আমার কাটল। মেজদাকে একটা জরুরি চিঠি লিখে দিলাম যে, আমি দু-একদিনের মধ্যে বাড়িতে আসছি। বড়দার খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে আচমকা তার লেখা একটা ডায়েরি এসে পড়েছে হাতে। বাড়িতে গিয়ে কথা হবে।

বাড়ি যাওয়ার আগের দিন আমার বন্ধু আনন্দকে তার বাড়িতে গিয়ে ধরলাম।

আনন্দ বলল, "আয়। তোকে ক'দিন দেখতে পাচ্ছি না।"

"ঝামেলায় ছিলাম। শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"বোস। চা খা। বলে আসি।"

আনন্দ বাড়ির ভেতরে গেল। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

"তোর কী মনে হচ্ছে রে, কৃপা ? বৃষ্টি আরও চলবে, না, বন্ধ হল ?" আনন্দ বলল।

"চলবে।" আমি বললাম।

"এখনও চলবে ! বলিস কী ! এবারে তো ভাসিয়ে দিল !"

"তা দিক। আশ্বিন মাসে বৃষ্টি বিদায় নেয় না। আরও একটা মাস ধরে রাখ।"

"অ্যানাদার মান্থ ! উঃ !"

"বৃষ্টির কথা রাখ। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

"বল ?"

"মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছিস ?"

"মন্দারগড়— ! মন্দার—গড় ! কই, না। কেন ?"

"তুই তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াস। ঘুরে বেড়ানো তোর নেশা। স্বভাব। তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আনন্দ মাথা নাড়ল। তবু ভাবছিল। বলল, "না ভাই ; ওরকম নাম শুনিনি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে গড় মান্দারণের কথা পড়েছি। সেটা তো শুনি পুরনো বিষ্ণুপুর জাহানাবাদ—ওসব এরিয়ার কোথাও একটা গড়টড় ছিল ! বলতে পারছি না। বানানো নামও হতে পারে। কেন ?"

"না-না, সে গড় নয়। এ একেবারে অন্য।"

"কোথায় ?"

"সেটাই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি।"

"বলতে পারব না।"

"ওড়িশা, এম-পি আর বিহারের বর্ডারের গায়ে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"কে বলল ?"

"ডায়েরির নোট পড়ে তাই মনে হচ্ছে।"

"ডায়েরি ! কার ডায়েরি ?"

"বড়দার।"

আনন্দ ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমার বড়দা যে আজ দু' বছর ধরে নিরুদ্দেশ—এ-কথা সে জানে। ভাল করেই জানে। তার সঙ্গে বড়দার ব্যাপার নিয়ে আমার কত কথাই হয়েছে কতবার। নতুন করে বলার কিছু ছিল না, শুধু এই দিন-দুই আগে যা ঘটেছে সেটা ছাড়া।

আনন্দ অবাক গলায় বলল, "তোর বড়দার ডায়েরি ! কই, আগে তো শুনিনি !"

"কেমন করে শুনবি ! আমি নিজে কি জানতাম ! গত বুধবার হঠাৎ এক রেজিস্ট্রি প্যাকেট এল আমার নামে। এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। খুলে দেখি তার মধ্যে বড়দার একটা পাতলা ডায়েরি খাতা। তাতে কিছু এলোমেলো লেখা। নোট্‌স গোছের।"

"কে পাঠিয়েছেন ? ভদ্রলোকের নামধাম... ?"

"ভদ্রলোকের নাম মুকুলমনোহর ত্রিবেদী।"

"দারুণ নাম তো ! মুকুলমনোহর !...তা কোথা থেকে

পাঠিয়েছেন ?"

"মধ্যপ্রদেশের কাটোরাঘাট বলে একটা জায়গা থেকে।"

"কোথায় জায়গাটা ?"

"বলছি। আগে ডায়েরির কথাটা শোন।"

আমি যতটা পারি সংক্ষেপ করে আনন্দকে ডায়েরি পাওয়া এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত বলছিলাম, এমন সময় চা এল।

চা রেখে বাড়ির কাজের ছেলেটি চলে যাওয়ার পর চা খেতে-খেতে আমার কথাগুলো সেরে ফেললাম।

আনন্দ খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—আমার কথা সে যতটা অবাক হয়ে শুনছে, ততটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বরং তার যেন অবিশ্বাসই বেশি।

আমি থামলাম।

আনন্দ বলল, "ডায়েরি খাতাটা এনেছিস ?"

"না। আমার কাছেই আছে। বাড়িতে।"

"আনলে পারতিস। পড়ে দেখতাম। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সারা বছর একটা জায়গায় কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ সবসময় জ্যোৎস্নার আলোর মতন আলো দেখা যাবে—এ কেমন করে হয় !"

"রোজই দেখা যায়, তা অবশ্য নয়। মাঝে-মাঝে যায় না। আবার দেখা যায়।"

"বড়দা কী লিখেছেন বল দিকি ?"

"বড়দার ডায়েরি থেকে আমার মনে হল, এইরকম আলো নাকি আগে আরও দু'বার দেখা গিয়েছিল। একবার সেই উনিশশো চল্লিশ সালের আগে। তারপর উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে। আর এখন আবার দেখা যাচ্ছে।"

"একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ?"

"মোটামুটি জায়গাটা এক। এক-আধ মাইল তফাত হচ্ছে।"

"বড়দা কি এই আলো দেখতেই ওখানে—মানে—কী গড় বললি—সেখানে গিয়েছিলেন ?"

"মন্দারগড় ! আমার মনে হয় বড়দা কোনও সূত্রে খবরটা শুনে ওখানে গিয়েছিল। দেখতে।"

"দু' বছর ধরে তিনি ওখানে বসে-বসে আলো দেখেছেন ? তাই হয় নাকি ?"

"কী জানি ! ডায়েরিতে কোথাও তারিখ নেই যে বুঝব—কবে গিয়েছিল ? কতদিন ছিল বড়দা।...আরও একটা-দুটো অদ্ভুত জিনিস লেখা আছে মন্দারগড় নিয়ে। লেখা আছে, ওই আলো যখন দেখা দেয়—তখন চারপাশ থেকে ঝিঁঝির ডাকের মতন এক শব্দ শোনা যায়। সে নাকি এমন শব্দ যে, খানিকক্ষণ পরে ঝিম ধরে যায় মাথায়। আর আলোর মধ্যে গড়ের মাথার ওপর একটা অদ্ভুত জিনিস—দেখতে অনেকটা সাবমেরিনের মতন—ছোট্ট ভেসেল ঘুরে বেড়ায়।"

"আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নাকি ? যাকে বলে ইউ-এফ-ও ?"

"কী জানি !...আরও দু-চারটে অবাক ব্যাপার আছে। ডায়েরি পড়লে বুঝতে পারবি।"

"তা তুই কী করবি ?"

"আমি একবার বাড়ি যাব দু-একদিনের মধ্যে। মেজদার সঙ্গে কথা বলব। ফিরে আসব আবার। তারপর খোঁজখবর করে মন্দারগড়ে যাব।...তুইও যাবি আমার সঙ্গে। পারবি না ? তোর অফিস থেকে ছুটি ম্যানেজ করতে পারবি না দিন আট-দশ ?"

আনন্দ হাসল। "পুজোর মুখে ছুটি ম্যানেজ করা মুশকিল। তবু যাব। তুই ভাবিস না।"

(ক্রমশ)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ব্যথানাশক যন্ত্র

খেলতে-খেলতে আঘাত পাওয়ার দরুন ব্যথা, পিঠে বা শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা, বাতজনিত ব্যথা, অস্ত্রোপচারের জায়গায় বেদনা ইত্যাদি উপশমে অভিনব একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে ইংল্যাণ্ডের একটি সংস্থা। যন্ত্রটির নাম 'জেনোস'। ১৯৯১ সালের ব্রিটিশ ডিজাইন পুরস্কার পেয়েছে। এর মূল ব্যাপারটা হল, শরীরের যেখানে ব্যথা তার দু'প্রান্তে দুটি ইলেকট্রোড চেপে ধরে সেখান দিয়ে নিম্ন কম্পাঙ্কের মৃদু তড়িৎ পাঠালে জায়গাটা চিনচিন করতে থাকে এবং ব্যথার অনুভূতি প্রশমিত হয়ে যায়। ট্রানজিস্টারের মতো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়, যন্ত্রটি রোগীর হাতেই

থাকে এবং বোতাম টিপে সে বিদ্যুৎ প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ দেহের নিজস্ব ব্যথানাশক উপাদান, এন্‌ডরফিন এবং এনকেফালিনস-এর উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে যন্ত্রণার উপশম ঘটায়। এ-ছাড়া যে-কোনও ব্যথার অনুভূতি সুষুম্নাকাণ্ড হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছবার পথেই খানিকটা কমে যায়, যাকে বলে 'গেট-কন্ট্রোল'। শিরদাঁড়ার ভেতরে সুষুম্নাকাণ্ডই এটা নিয়ন্ত্রণ করে। জেনোস এই নিয়ন্ত্রণেও মদত দেয়। ফলে দু'দিক থেকেই চলে ব্যথা দমনের ক্রিয়া।

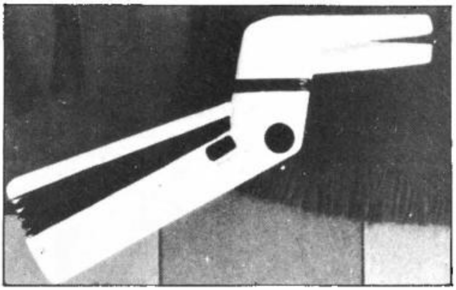

অভিনব কাঁচি

বিশ্বের যাবতীয় কাঁচির কর্মপদ্ধতি মোটামুটি একইরকম। এর দুটি ব্লেড, প্রতিটি ব্লেডের একপ্রান্ত কাটার জন্য, অন্যপ্রান্তটি আংটার মতো। দুই ব্লেডের দুই আংটার একটিতে বুড়ো আঙুল, অন্যটিতে মধ্যমা ঢুকিয়ে কোনও জিনিস কাটতে হয়। কাঁচি হল একটি প্রথম শ্রেণীর 'লিভার'। ফলে আঙুলের চাপ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে কাটার শক্তি বাড়িয়ে দেয়। এবার কাঁচির জগতেও বিপ্লব আসছে। আর দু' আঙুল গলিয়ে কাঁচিতে কাপড়, কাগজ কিংবা চুল কাটতে হবে না। ইজরায়েলের একটি সংস্থা এমন এক ধরনের কাঁচির পরিকল্পনা করেছে, যার কোনও আংটাই নেই। তার বদলে আছে সাঁড়াশি বা চিমটের মতো দুটি বাঁট, ওপরে-নীচে ক্রমাগত চাপ দিলেই ব্লেড চলতে থাকবে এবং কাটতে থাকবে। এতে কাটার জায়গায় শক্তিও হবে প্রচলিত কাঁচির তুলনায় অনেক বেশি।

চাঁদের বাতাস

চাঁদে কোনও বাতাস নেই বলেই তো আমরা জানি। তা হলে এ প্রশ্ন উঠছে কেন ? নতুন কিছু আবিষ্কার হল নাকি ! বলা যেতে পারে, তেমনই একটা ব্যাপার ঘটেছে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল মেন্ডিলো এবং ব্রায়ান ফ্লিন নামে এক ছাত্র টেক্সাসের ম্যাকডোনাল্ড মানমন্দিরে বসে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে চাঁদের অতিশয় ক্ষীণ আবহমণ্ডলের একটি ছবি তুলেছেন। চান্দ্র আবহে সোডিয়াম পরমাণুর বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী ছবিতে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন রং। ক্যামেরায় বিশেষ ধরনের মাস্ক ব্যবহার করে চাঁদ থেকে আসা উজ্জ্বল আলো বন্ধ করে দিয়ে এমন এক ফিল্টার লাগিয়ে তাঁরা ছবি তুলেছেন, যা শুধু সোডিয়ামঘটিত আলোকেই ঢুকতে দেয়। চাঁদের বাতাস বলতে ওই ভাসমান সোডিয়াম অণুর সমাবেশ, চন্দ্রবক্ষে সর্বদা উল্কাপতনে যার উদ্ভব। অবশ্য এ-বাতাস খুব পাতলা। চাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের বহু কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, চাঁদের বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি যতদূর মনে করা হত, তার চেয়ে অনেক বেশি।

যন্ত্রকীট

ব্রিটিশ ডিজাইন এঞ্জিনিয়ার আর্থার কোলির শখ ছিল মাঠঘাট থেকে বিট্‌ল্ সংগ্রহ করা। তারপর সেই কীট ঘরে নিয়ে এসে গ্রাফ পেপারের ওপরে রেখে তাদের ছবি তুলতেন। আর নানাভাবে খুঁটিয়ে দেখতেন

তাদের আচার-আচরণ। কোলি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেন যে, পোকাগুলো বেয়ে ওঠার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এই গুণে অনুপ্রাণিত হয়ে কোলি বিট্‌ল-এর যান্ত্রিক সংস্করণ তৈরি করে ফেলেন এবং সেই যন্ত্রকীটের নাম দেন 'রোবাগ'।

অবশ্য এটা ঠিকই যে, আসল কীটের সঙ্গে তার রোবট সংস্করণের কয়েকটি তফাত রয়েছে। যেমন বেয়ে ওঠার সময়ে জমি আঁকড়ে ধরতে বিট্‌ল নখ ব্যবহার করে। আর রোবাগের চার পায়ে নখের বদলে রয়েছে ভ্যাকুয়াম সাকার। এর সাহায্যে প্লাইউড কিংবা কাচের প্লেট বেয়েও সহজে উঠে পড়ছে এই যন্ত্রকীট। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রকীট সম্পর্কে আর্থার কোলি মন্তব্য করেছেন, "কোন ধরনের জমিতে কতটা জোরে পা আঁকড়ে ধরতে হবে সেটা ঠিক করে দেয় আমার রোবটের মাইক্রোপ্রসেসর ব্রেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সাকারগুলোর সাকশন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।"

এ ছাড়া বেয়ে ওঠার তল যদি খাড়া কিংবা হেলানো হয় রোবাগ সে-ক্ষেত্রেও নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সুতরাং কলকারখানা-শিল্পে রোবাগ ব্যবহারের কোনও অসুবিধে নেই। রোবাগ ইটের দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারবে, আবার অয়েল রিগের ধাতব সিঁড়ি বেয়েও ওঠানামা করতে সে সক্ষম। আর যদি রোবাগের সঙ্গে ক্যামেরা লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে জলের তলায় জাহাজের খোল পরীক্ষা করে দেখা অথবা আকাশে ওড়া এরোপ্লেনের স্বাস্থ্য খতিয়ে দেখা রোবাগের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

বোতলের মধ্যে ঝড়

কোনও ঝড়কে কি বন্দি করা যায় একটা ছোট বোতলের মধ্যে ? রবার্ট একে নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী তেমনই একটা ব্যাপার করে ফেলেছেন। অবশ্যই জাদুবলে নয়, তিনি কৃত্রিম উপায়ে ঝোড়ো আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন ইঞ্চিচারেক চওড়া একটি প্লাস্টিক

সিলিন্ডারের মধ্যে। নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির এই বিজ্ঞানী ওই সিলিন্ডারে এক ইঞ্চির মতো গভীর একটুখানি জল নিয়ে ইলেকট্রিক হিটারের সাহায্যে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মাত্র পাঁচভাগের একভাগ তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করেন, জল গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে নেমে আসে নীচে। এরকম যখন চলতে থাকে, সিলিন্ডারটিকে একটি টার্নটেবিলের ওপরে রেখে ক্রমাগত ঘোরানো হয়। ঘূর্ণনের বেগ প্রতি ১০ সেকেন্ডে একবার। পৃথিবীও একই বেগে নিজের অক্ষের ওপরে ঘোরে। ফলে পৃথিবীর বুকে সূর্যতাপে বাতাস গরম ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপরে পৃথিবীর আহ্নিক গতির টানে যে আবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, প্লাস্টিক সিলিন্ডারে একে তারই অতি ক্ষুদ্র এক সংস্করণ করে তোলেন। জল সেখানে কীভাবে ঝোড়ো চেহারা নিচ্ছে, তা ভিডিও ক্যামেরায় লক্ষ করা হয়। রঙিন ছবিটি সেই ঝড়েরই একটি মুহূর্তের স্থিরচিত্র। নীল রং ঠাণ্ডা জলের অবস্থান বোঝাচ্ছে, লাল হল উষ্ণ জলের। ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়ে এদের গতি ও চাঞ্চল্য। লাল রঙের বুদ্বুদগুলি ওপরে উঠতে উঠতে একে অন্যের সঙ্গে ক্রমাগত ধাক্কা খায়, ভেঙে যায়, ফের জেগে ওঠে নতুন করে। একেবারে মিনি সাইক্লোন।

জীবাণু থেকে কম্পিউটার

আজকের মানুষের উৎস যেমন নিহিত রয়েছে মহাবিশ্বের আদি ডিম্বে, তেমনই আগামী প্রজন্মের কম্পিউটারেরা হয়তো ঋণী থেকে যাবে আজকের 'সল্টমার্শ' গাছের কাছে। সিরাকিউজ ইউনিভার্সিটির 'সেন্টার ফর মলিকিউলার ইলেকট্রনিক্স' এর ডাইরেক্টর রবার্ট বার্জ জানিয়েছেন, "মার্শের মধ্যে যেসব জীবাণু থাকে তারা

কয়েকটি রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। এইসব যৌগ ব্যবহার করে কম্পিউটার এক ঘনইঞ্চি জায়গার মধ্যে কোটি-কোটি তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে।" ব্যাকটিরিও রোডোপসিন (বি-আর) নামের একরকম প্রোটিনের অণু যখন আলো শোষণ করে, তাদের রং উজ্জ্বল গোলাপি থেকে পালটে হলুদ হয়ে যায়। আজকের ডিজিটাল কম্পিউটারে যেভাবে তথ্য সঞ্চয় করা হয় বা উদ্ধার করা হয়, বি-আর-এর এই দুটি ধরন প্রায় একইভাবে সে-কাজ করতে পারে। লেজার রশ্মি কোনও বি-আর অ্যারের ওপরে এসে পড়লে অণুগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, হলুদ রং বদলে যায় গোলাপিতে, অথবা গোলাপি অণু হয়ে যায় হলুদ। টু-ডাইমেনশনাল বা দ্বিমাত্রিক বি-আর ফিল্ম তৈরি হয়েছে বেশ কিছুদিন। তবে গত বছরের শেষ দিকে বার্জ ঘোষণা করেছেন, তিনি ছোট প্লাস্টিকের ঘনকে বি-আর অণু বসাতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং এই ত্রিমাত্রিক বি-আর অ্যারের মধ্যে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার গুণ বেশি তথ্যসঞ্চয় ক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে।

বার্জের গবেষণায় দুটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে : অপটিক্যাল কম্পিউটিং ও মলিকিউলার কম্পিউটিং। আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে এই দুই প্রযুক্তির কম্পিউটার যে দোকানে-দোকানে বিক্রি হবে এমন সম্ভাবনা নেই। তবে এ-টি অ্যান্ড টি-বেল ল্যাবরেটরিজ গত বছরেই পৃথিবীর প্রথম অপটিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

জীবজন্তুরাও শিখতে পারে মানুষের ভাষা...

সিলমাছের ভাষা-জ্ঞান

জীবজন্তুদের বুদ্ধি, এমনকী ভাষা শেখার ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবং এখনও হচ্ছে। একশ্রেণীর ছোট আকারের সিলমাছ নিয়ে এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা চালাচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত মনোবিজ্ঞানী রোনাল্ড শুস্টারম্যান। রকি এবং রিও নামে দুটি স্ত্রী-সিল তাঁর পরীক্ষার মাধ্যম। এতে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি কুলুঙ্গিতে মাছ, একখণ্ড হাড় এবং একটি পুতুলের শিল্যুট অর্থাৎ কালো ছবি রেখে দেখা হচ্ছে সিলমাছেরা সেগুলি ঠিক-ঠিক চিনতে পারে কি না। শুস্টারম্যানের পদ্ধতিটা এইরকম : প্রথমে যে-কোনও একটি শিল্যুট, ধরা যাক একটি কাঁচির ছবির সঙ্গে লোভনীয় কোনও খাবার রেখে প্রাণীটিকে আর একটি শিল্যুট—এখানে হাড়ের ছবির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ কোনও একটা যোগসূত্রের ধারণা দেওয়া হচ্ছে। ধরা যাক, প্রথম কাঁচির শিল্যুটগুলি 'এ' এবং হাড়ের ছবিটি 'বি', তারপর আর-একটি সেট তৈরি করে, যাতে কাঁচিটি বাদ দিয়ে রাখা হয় একটি মাছ, হাড় এবং পুতুলের 'সি' শিল্যুট, শুস্টারম্যান লক্ষ করেন—প্রাণীটি মাছ নয়, হাড়টিকে (বি) পুতুলের (সি) সঙ্গে ম্যাচিং করতে পারছে কি না। আসল পরীক্ষাটি হয় তিন নম্বর সেটে, যেখানে রাখা হয় পূর্বোক্ত কাঁচি (এ), পুতুল (সি) এবং সম্পূর্ণ অদেখা একটি বস্তুর ছবি। এর পর দেখা হয় সিলটি অজানা বস্তুটিকে এড়িয়ে কাঁচি আর পুতুলের মধ্যে কোনও যোগসূত্র খুঁজে পায় কি না। তৃতীয় পরীক্ষাটি সফলও হয়েছে। অর্থাৎ রকি প্রমাণ করেছে এ=সি এ-ধরনের ১৮টি টেস্টের মধ্যে ১৬টিতেই রিও আর রকি বের করতে পেরেছে অভিপ্রেত যোগসূত্র। শুস্টারম্যানের ধারণা, এ-ধরনের সংযোগ চেনার ক্ষমতা আসলে ভাষা শেখারই পূর্ব ধাপ। এবং অন্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই এ-জাতীয় ক্ষমতা পরীক্ষায় প্রমাণিত হতে পারে।

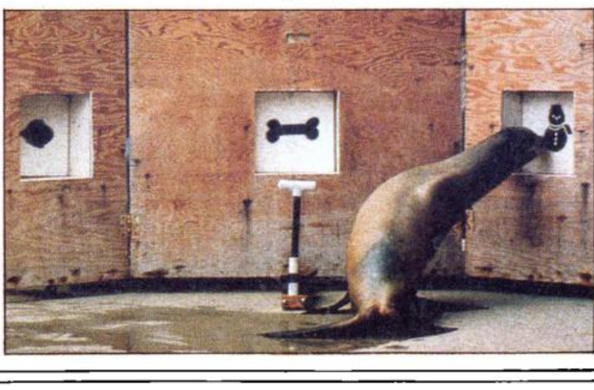

প্রথম ফোটোগ্রাফ

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ফোটোগ্রাফ। এভারেস্ট-শৃঙ্গ, সমুদ্রতল, সূর্যাস্ত, ব্যারিকেড ও গিলোটিন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং এ-ধরনের আরও নানা বিষয়ের বিস্ময়কর প্রথম ফোটোগ্রাফের সঙ্কলন। গ্রন্থনা করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ

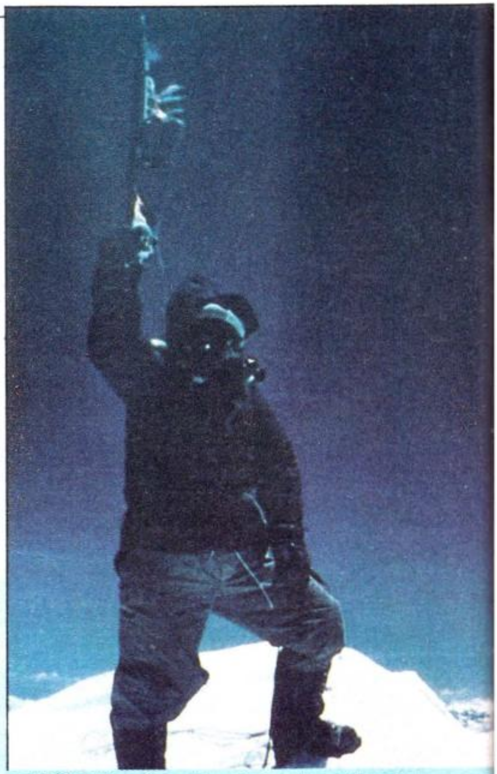

মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে এডমণ্ড হিলারি-র তোলা তেনজিং নোরগের ফোটোগ্রাফ

রামধনুর রঙিন ফোটোগ্রাফ। ১৯১১ সালে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ন-এ ছবিটি তোলেন আর্নল্ড জেনথে

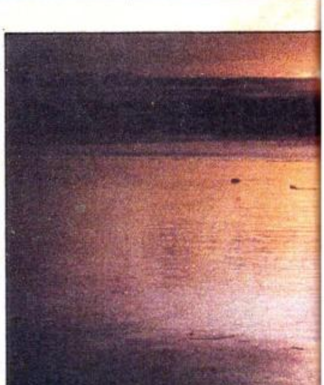

সূর্যাস্তের রঙিন ফোটোগ্রাফ। আনুমানি

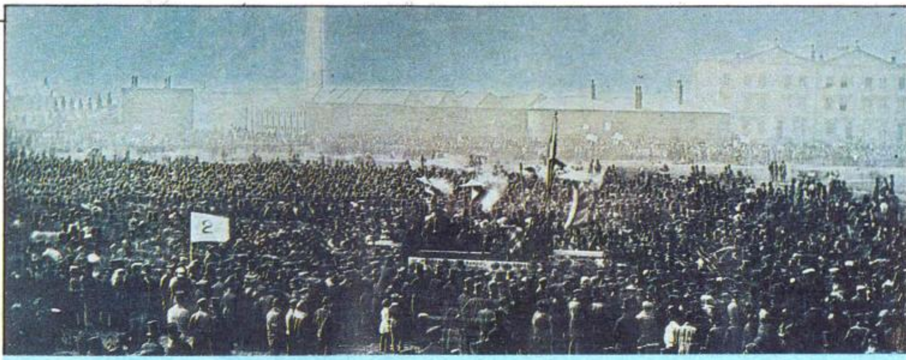

লণ্ডনের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সমাবেশ। ফোটোগ্রাফ : ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল

ভারতে তোলা প্রথম ফোটোগ্রাফগুলির একটি, অজ্ঞাত ফোটোগ্রাফারের তোলা। আনুমানিক ১৮৪৩ সাল

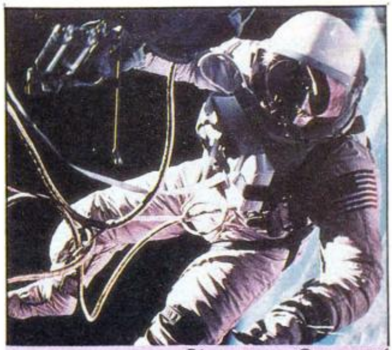

১৯৬৮-সালের জুনে মার্কিন মহাকাশচারী এডওয়ার্ড হোয়াইট-এর রঙিন ছবিটি তোলেন ম্যাকডিভিট

৯১১ সালে আর্নল্ড জেন্‌থে-এর তোলা

সমুদ্রের তলদেশের রঙিন ফোটোগ্রাফ। ১৯২৭ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ প্রকাশিত ডক্টর লংলি ও মার্টিন-এর আটটি প্রতিচ্ছবির অন্যতম

শ্যাওলার ফোটোগ্রাফ। জন হার্শেল উদ্ভাবিত সায়ানোটাইপ পদ্ধতিতে ১৮৪৩ সালে ছবিটি তোলেন ব্রিটেনের অ্যানা অ্যাট্‌কিন্স

প্রথম রঙিন ফোটোগ্রাফ। বিজ্ঞানী জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ছবিটি তোলেন ১৮৬১-তে

দূরবীক্ষণের সাহায্যে তোলা রাতের আকাশের রঙিন ছবি। হ্যাল মানমন্দির থেকে ১৯৫৯ সালে তোলা ভেল নীহারিকা

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ। সুইডিশ ফোটোগ্রাফার লেনার্ট নিলসন ১৫ সপ্তাহ বয়সের এই ভ্রূণটির ছবি তোলেন ১৯৬৪ সালে

কম্পিউটারের সাহায্যে তোলা পৃথিবীর প্রতিবিম্ব। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ১৯৭৫ সালের ৩ মার্চ ফোটোটি পাঠানো হয়। ফোটোতে দক্ষিণ ফ্লোরিডা দেখা যাচ্ছে

প্রথম দাগেরোটাইপ। ১৮৩৭ সালে দাগারের তোলা তাঁর স্টুডিয়োর ছবি

১৮২৬-'২৭ সালে ফ্রান্সের নিপসে ছবি দুটি তুলেছিলেন। ছবি তুলতে আট ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ওপরের ও নীচের এই দুটিই হল প্রথম ফোটোগ্রাফ

ক্যামেরার চোখ কোথায় না ছুটে চলে! সমুদ্রের অতল থেকে হিমালয়ের চুড়ো, জেনেটিক তথ্যের বাহক ডি. এন. এ. অণু থেকে মহাশূন্যের সুদূরে ছায়াপথের বিস্ফোরণ। ক্যামেরার চোখ যা দেখে, তার ছাপ তুলে নেওয়া হয় রাসায়নিক প্রলেপ দেওয়া প্লেট (কাচ) বা ফিল্মের ওপর। মানুষের চোখ দেখতে পায় না এমন অদৃশ্য আলোর ছাপও তুলে নেওয়া যায় প্লেট বা ফিল্মে। এক্স-রে ছবি তার একটি উদাহরণ।

ফোটোগ্রাফি রাতারাতি বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। ১৮২৬ সালে প্রথম ফোটোগ্রাফটি তুলতে নিপ্‌সের আট ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অবশ্য ১৮৩৯ সালকেই আমরা ফোটোগ্রাফির জন্মের বছর হিসেবে গণ্য করি, কারণ ওই বছরেই ফ্রান্সের জে. এম. দাগারে ও ইংল্যান্ডের ডব্লিউ. এইচ. ফক্স ট্যালবট ব্যবহারোপযোগী দুটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভাবনের কথা ঘোষণা করেন। দাগারে উদ্ভাবিত 'দাগেরোটাইপ' ছবি গৃহীত হত রুপোর প্রলেপ দেওয়া তামার পাতের ওপর। এর থেকে একাধিক প্রিন্ট দেওয়া সম্ভব ছিল না। ট্যালবট উদ্ভাবিত 'ক্যালোটাইপ'-এ নেগেটিভ থেকে যত খুশি পজিটিভ বা মূল ছবি ছাপা যেত। ক্রমশ ক্যামেরা ও ফিল্মের আরও নানা উন্নতি ঘটে, ছুটন্ত বস্তুর বা প্রাণীর কিংবা আরও অল্প আলোয় ছবি তোলা সম্ভব হয়। রঙিন ছবি তোলার তত্ত্ব বিজ্ঞানী হার্শেল সচিত্র পেশ করলেও, ১৯০৭ সালে 'অটোক্রোম' পদ্ধতির সুবাদেই রঙিন ফোটোগ্রাফ গ্রহণ প্রচলিত হয়।

'প্রথম ফোটোগ্রাফ' থেকে যেমন আমরা ফোটোগ্রাফির ইতিহাসের অনেক যুগান্তকারী ঘটনার কথা জানতে পারব, তেমনই বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও ফোটোগ্রাফির অবদানের কথা উপলব্ধি করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ফোটোগ্রাফে তাঁদের বয়স যথাক্রমে আনুমানিক ছাব্বিশ-সাতাশ, তেরো এবং এক বছরেরও কম। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়। সহজে ও সুলভে ছবি তোলার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গেও প্রথম ফোটোগ্রাফ-এর নিদর্শনগুলির নিকট-সম্পর্ক।

১৮৭৪ সালে তোলা রবীন্দ্রনাথের প্রথম ফোটোগ্রাফ। কলকাতার ওয়েস্টফিল্ড কোম্পানিতে তোলা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ থেকে বিচ্ছিন্ন করা

সহধর্মিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সাল

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

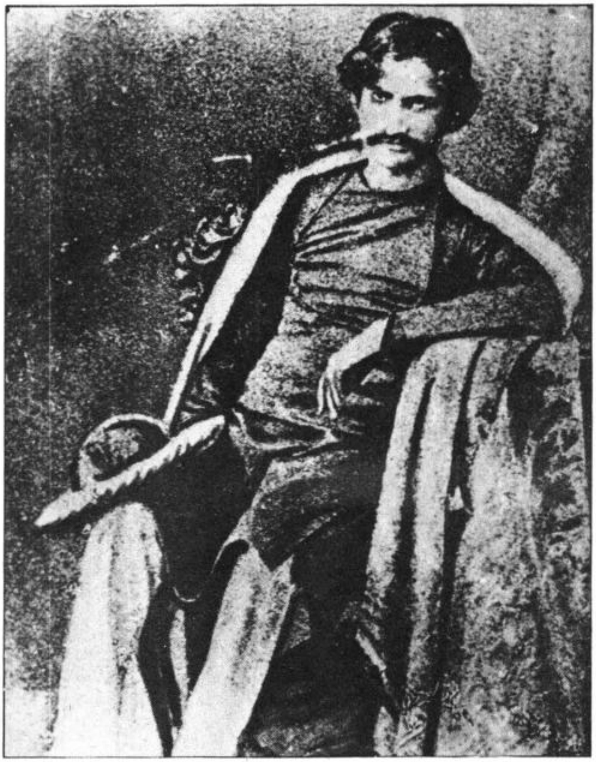

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
তাঁর বয়স তখন প্রায়
ছাব্বিশ কি সাতাশ

সত্যজিৎ রায়ের একক ফোটোগ্রাফ । বয়স এক বছর

মা সুপ্রভা দেবীর কোলে শিশু সত্যজিৎ

বাঙালি মহিলা ফোটোগ্রাফার অন্নপূর্ণা দত্তের আত্মপ্রতিকৃতি

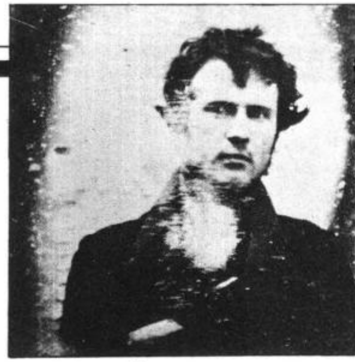

প্রথম ফোটো-পোর্ট্রেট। ১৮৩৯ সালে ফিলাডেলফিয়ার রবার্ট কর্নেলিয়াসের তোলা

ফোটো-মন্তাজ। একাধিক ছবির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এটি সৃষ্টি করেন ফক্স ট্যালবট

ফোটোগ্রাফের দোকান। ১৮৪৩-'৪৪ নাগাদ স্থাপিত হয় ফক্স ট্যালবটের প্রতিষ্ঠান 'রিডিং এস্‌টাবলিশমেন্ট'

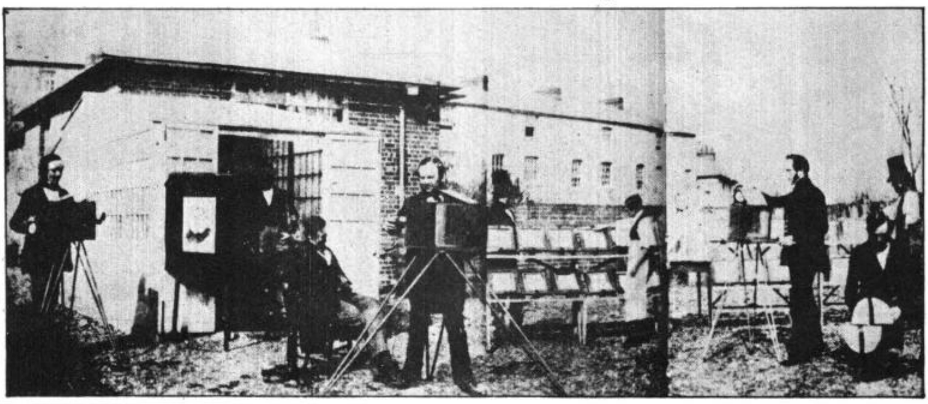

ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রদর্শনী। কলকাতা, ১৮৯৪ সাল

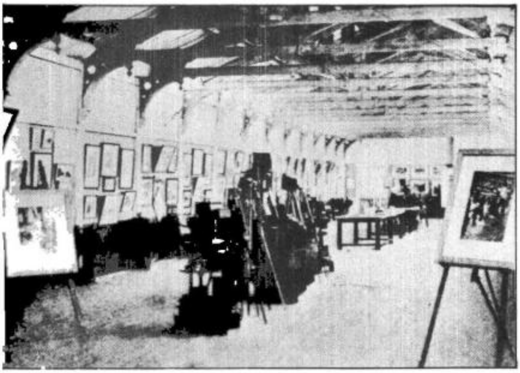

ফোটোগ্রাফিক প্রদর্শনী। ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব লন্ডনের নিয়মিত প্রদর্শনী শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। ছবিটি ১৮৫৮ সালে তোলা

ভারতের ফোটোগ্রাফিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালি ফোটোগ্রাফারের কাজ। আর্যকুমার চৌধুরীর তোলা। ১৯১৩ সাল

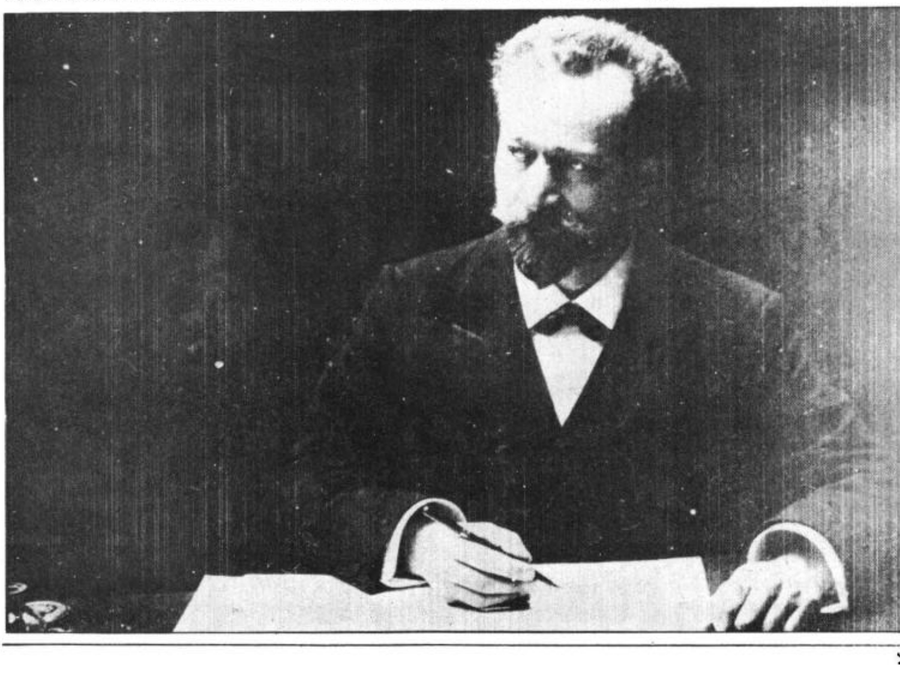

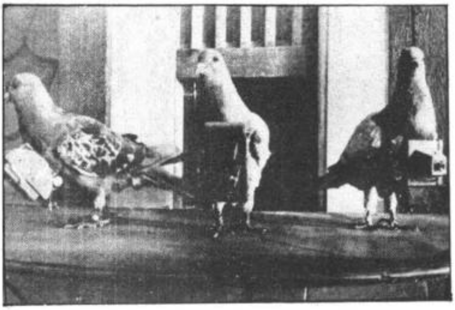

পায়রার তোলা ফোটোগ্রাফ। ওপরের ছবিতে বুকে ক্যামেরা ঝোলানো পায়রা। নীচে, ওদেরই কারও তোলা জার্মানির দৃশ্য। ১৯০৭ সালে তোলা

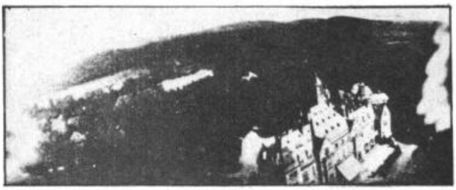

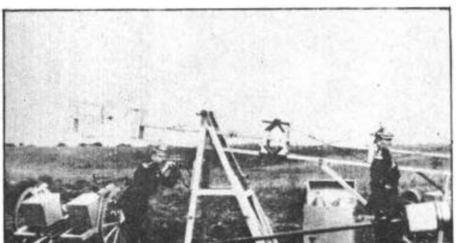

ক্যামেরাযুক্ত রকেট। ১৯০৩ সালে জার্মানির আলফ্রেড মল্ উদ্ভাবিত এই রকেট ২৬০০ ফিট ওপর থেকে ফোটো তোলে

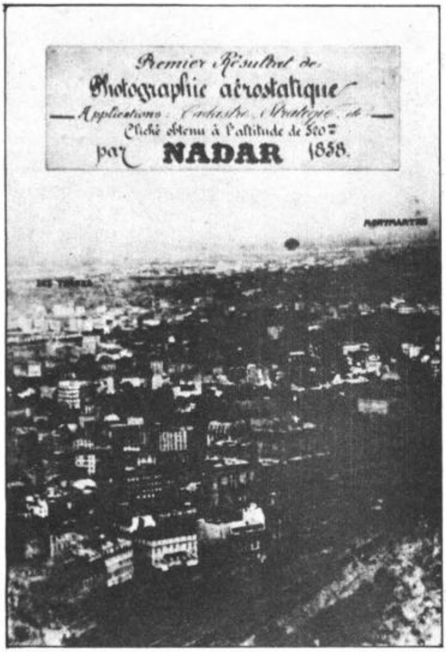

আকাশ থেকে তোলা ফোটোগ্রাফ। ফরাসি ফোটোগ্রাফার নাদার ১৮৫৮ সালে বেলুন থেকে প্যারিসের এই ছবিটি তোলেন। কলকাতার এফ কাপ কোম্পানিও ১৮৯২ সালে বেলুন থেকে ফোটো তুলেছিল, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় না

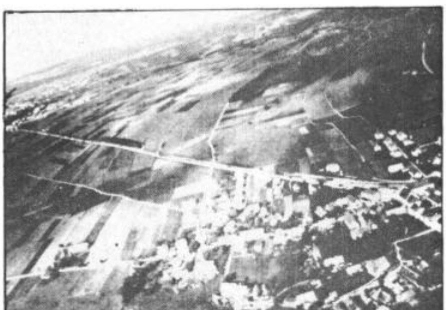

মল-এর রকেট থেকে তোলা ছবি। ছবি তোলার পর ক্যামেরাটিকে প্যারাশুটে করে নামিয়ে আনা হয়

ডান দিকে, গ্রন্থচিত্রণে ফোটোগ্রাফ। ওয়াল্টার স্কট-এর 'দ্য অ্যান্টিকুয়ারি' গল্পের জন্য ছবিটি ১৮৪৬-'৪৭ সালে তুলেছিলেন হিল ও অ্যাডামসন। নীচে, প্রথম ফোটোটাইপসেটিং-এর (পি. টি. এস.) নমুনা। ফক্স ট্যালবট হরফ মুদ্রণের এই ব্যবস্থার পেটেন্ট নেন ১৮৪২ সালে

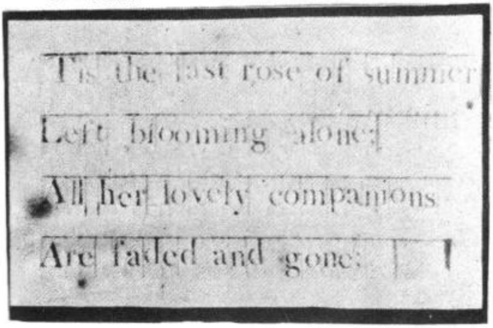
'Tis the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;

রবিবাসরীয় ১

শতাব্দীর বিচার

গণনাট্যের স্বপ্ন এখনও স্ব হয়ে বেঁচে আছে

চোর চাই

আংশিকভাবে ফোটোটাইপসেটিং-করা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। ১৯৮১ সালের ৫ এপ্রিল

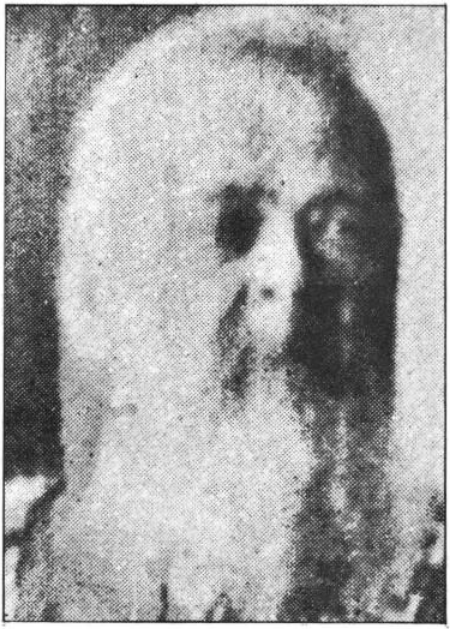

তারবাহিত ফোটোগ্রাফ। ১৯০৫ সালে বিদ্যুতের সাহায্যে স্থানান্তরে ফোটোগ্রাফিক প্রতিবিম্বটি পাঠান এই পদ্ধতির উদ্ভাবক মিউনিখের প্রোফেসর আলফ্রেড কোর্ন

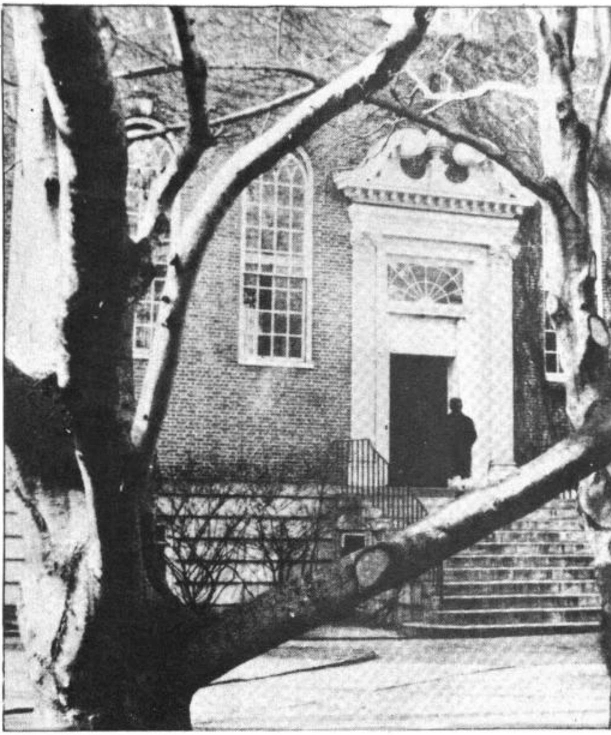

১৯৪৬ সালে তোলা পোলারয়েড ছবি। এডউইন হারবার্ট ল্যান্ড উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে শাটার টেপার পরে, ক্যামেরার, মধ্যেই যাবতীয় রাসায়নিক কাজ সম্পূর্ণ করে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রিন্ট বেরিয়ে আসে

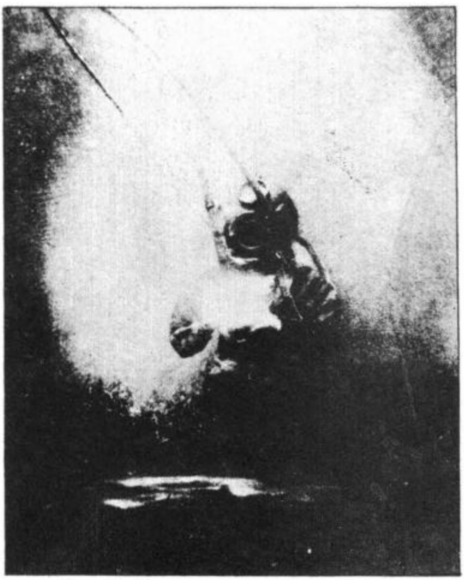

সমুদ্রের নীচে লুই বুর্ত

জলের মধ্যে তোলা ফোটোগ্রাফ। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের লুই বুর্ত-এর উদ্ভাবিত ক্যামেরা দিয়ে তোলা

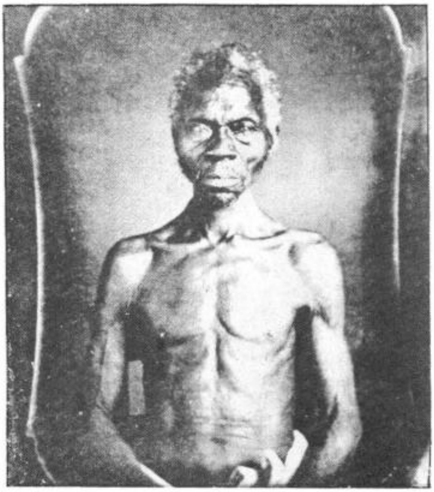

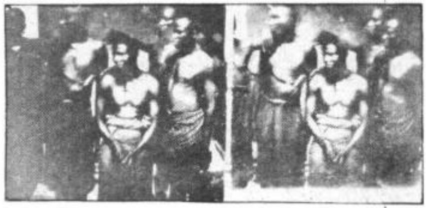

আফ্রিকায় ক্রীতদাসের হাট। ১৮৫৮ সালে জাঞ্জিবারে ছবিটি তোলেন জে. এ. গ্র্যান্ট

ক্রীতদাস। কঙ্গোর সন্তান জেন্টি। ১৮৫০ সাল নাগাদ কলম্বিয়ার খামারে এই ছবি তুলেছিলেন জে. টি. জিলি

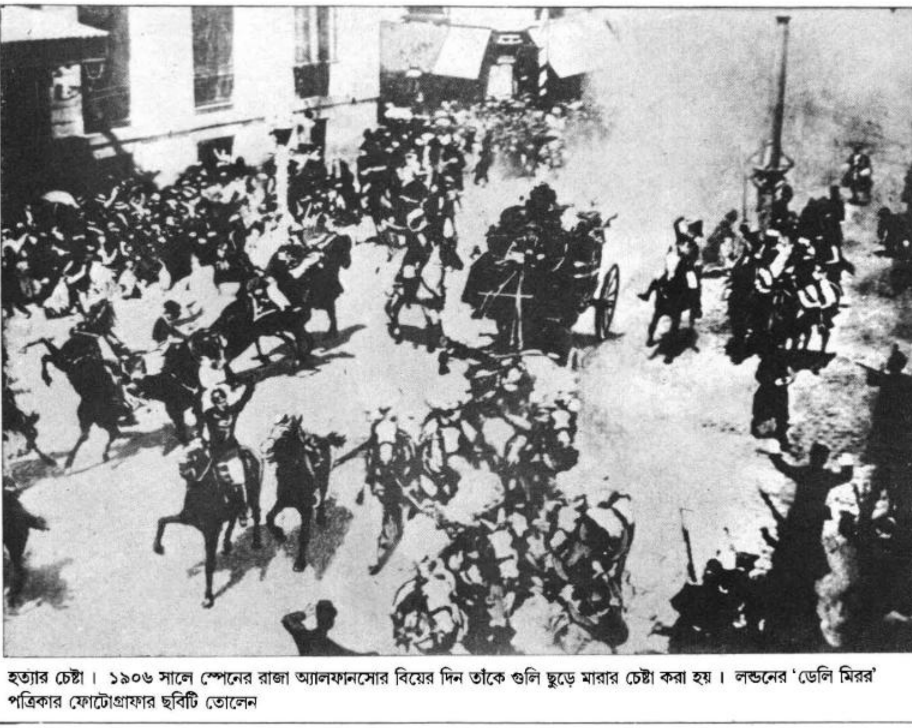

হত্যার চেষ্টা। ১৯০৬ সালে স্পেনের রাজা অ্যালফানসোর বিয়ের দিন তাঁকে গুলি ছুড়ে মারার চেষ্টা করা হয়। লন্ডনের 'ডেলি মিরর' পত্রিকার ফোটোগ্রাফার ছবিটি তোলেন

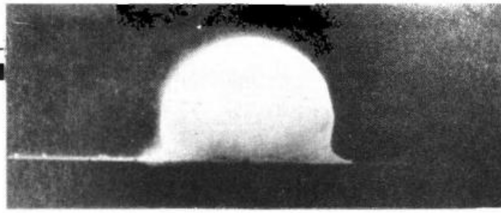

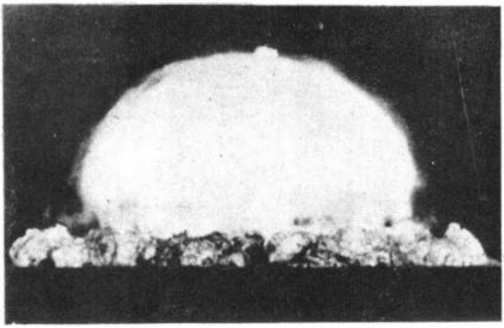

অ্যাটম বোমা। ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগর্ডো মরুভূমিতে

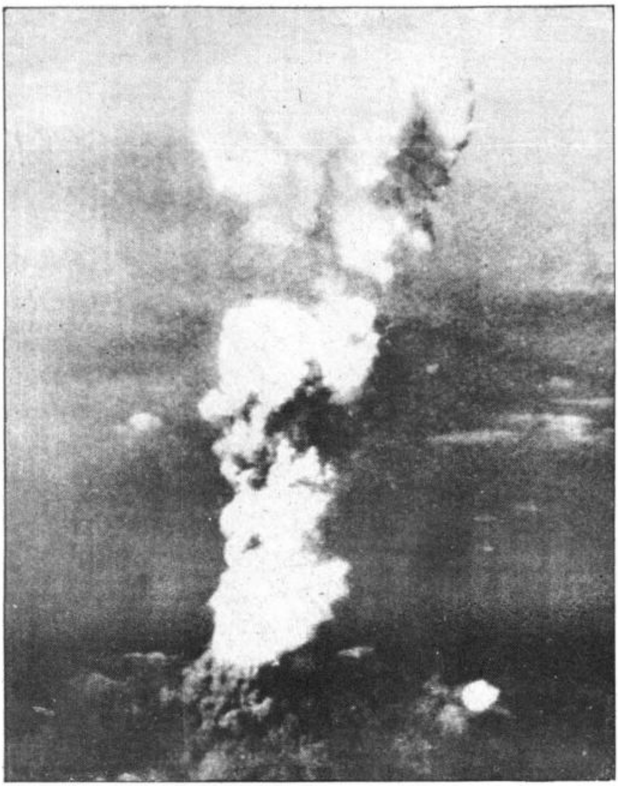

হিরোশিমার ওপর অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ। ১৯৪৫ সালের ৬ অগস্ট এই ধোঁয়ার মেঘের নীচে মুহূর্তের মধ্যে ৭৫ হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যান

ব্যারিকেড । ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ১৮৪৯ সালে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার হিপোলাইট বেয়ার্ড ছবিটি তুলেছিলেন । একটু আগেই খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে । রাস্তার ধারে জমা-করা পাথরের টুকরো দেখা যাচ্ছে

গিলোটিন । ১৮৬৮ সালের ২৪ নভেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় দু'জন গ্যারিবল্ডি-পন্থীকে গিলোটিনে চড়ানো হয় । তারই কিছুক্ষণ আগে, রোমে তোলা ছবি

কলকাতার রাজনৈতিক জনসমাবেশ । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন হেমেন্দ্রমোহন বসুর তোলা ছবিটিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিচ্ছেন

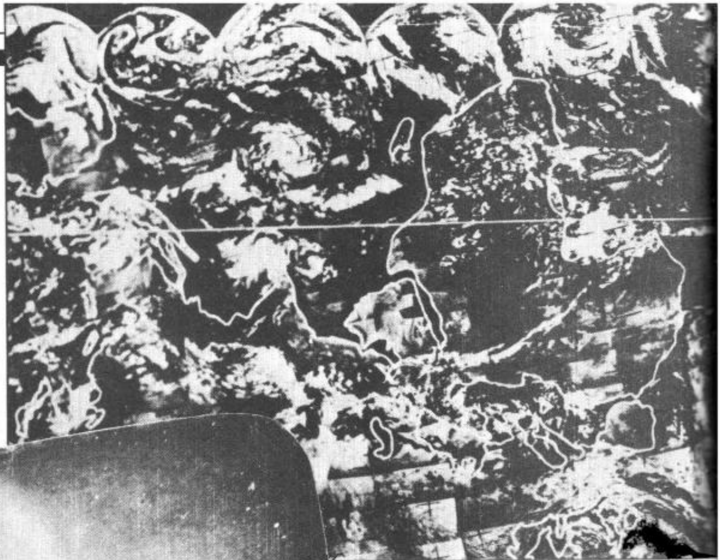

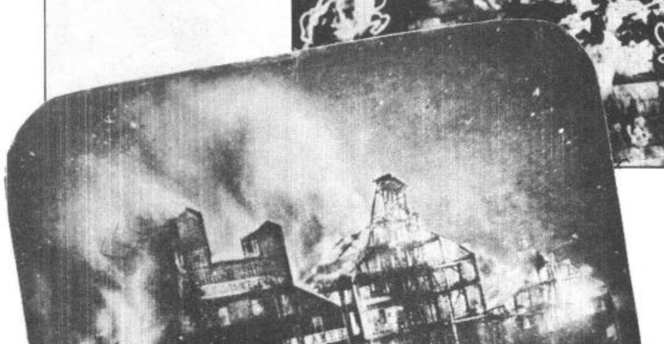

মেঘ ও সমুদ্র। ১৮৫৬ সালে ফরাসি চিত্রকর গুস্তাফ ল্য গ্রে-এর তোলা ছবিটি সে-বছরে লন্ডনের ফোটোগ্রাফিক প্রদর্শনীতে আলোড়ন তোলে

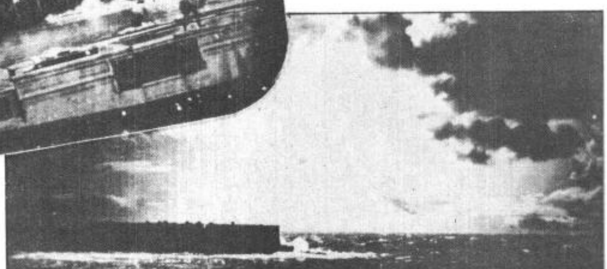

অগ্নিকাণ্ড। ১৮৫৩ সালের ৫ জুলাই নিউ ইয়র্কের ওস্‌ওয়েগো মিল-এ আগুন লাগার ছবিটি তোলেন জর্জ এন বার্নার্ড

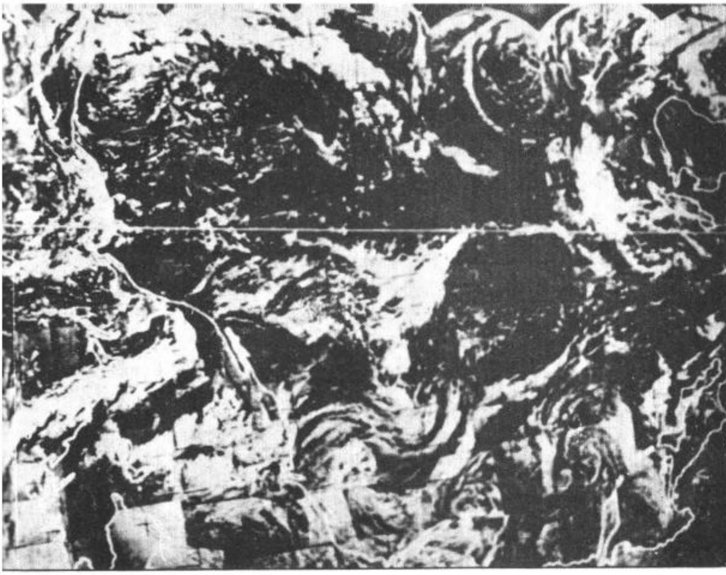

পৃথিবীর আবহাওয়া। কৃত্রিম উপগ্রহ টাইরাস-নাইন এই প্রতিবিম্বটি পাঠায় ১৯৬৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি

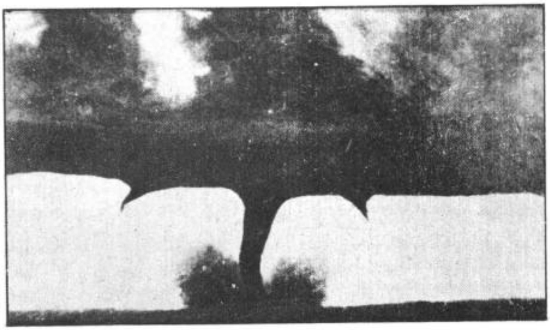

টর্নেডো। দক্ষিণ ডাকোটার হাওয়ার্ড নামক জায়গায় ১৮৮৪ সালের ২৮ অগস্ট তোলা

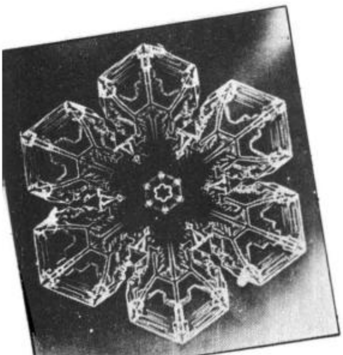

তুষারকণা। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ১৮৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ছবিটি তোলের উইলসন বেন্টলি

আইসবার্গ। ১৮৬৯ সালে উত্তর মেরু অভিযাত্রী মার্কিন দলের সদস্য ডানমোর বা ক্রিচারসন-এর তোলা

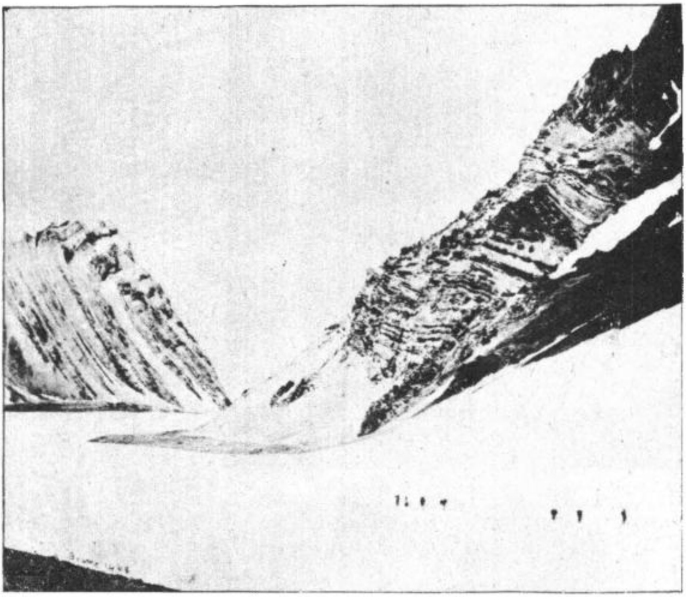

হিমালয়। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে স্যামুয়েল বোর্ন ভারত থেকে তিনবার হিমালয় অভিযান চালান ছবি তোলার জন্য। মনিরুং গিরিদ্বারের এই ছবিটি ১৮,৬০০ ফিট ওপর থেকে তোলা

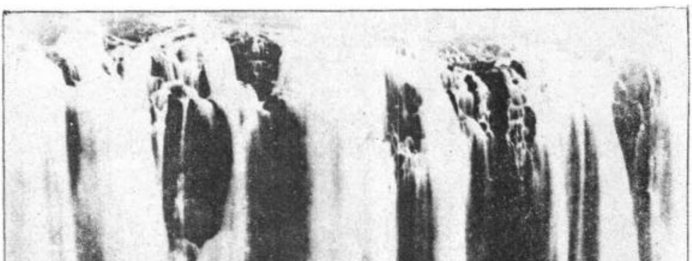

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। ১৮৫৫ সালে অভিযাত্রী লিভিংস্টোন জলপ্রপাতটির সন্ধান পেলেও তার প্রথম ফোটো তোলেন ডব্লিউ ই. ফ্রাই, ১৮৯২ সালে

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ। ১৯২৭ সালে আরিজোনার নিস্‌ক্লা নিতজাডি কেনিয়নে চার্লস এল. বার্নহাইমারের তোলা

ডাইনোসরের ডিম। ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানীদের একটি দল মঙ্গোলিয়া সফরের সময়ে প্রথম ডাইনোসরের ডিমের সন্ধান পান। জর্জ ওলসেন ডিমগুলি আবিষ্কার করেন আর ছবি তোলেন জে. বি. শ্যাক্‌লফোর্ড

ছুটন্ত ঘোড়া। একাধিক ক্যামেরার সাহায্যে এডওয়ার্ড মায়ব্রিজ একটি ছুটন্ত ঘোড়ার এই ফোটোগ্রাফ-মালা গ্রহণ করেন ১৮৭৮ সালের ১৫ জুন। এই প্রথম প্রমাণিত হল যে, দৌড়বার সময়ে, বারে-বারে ক্ষণেকের জন্য ঘোড়ার চারটি পা-ই মাটির সঙ্গে ছুঁয়ে থাকে না

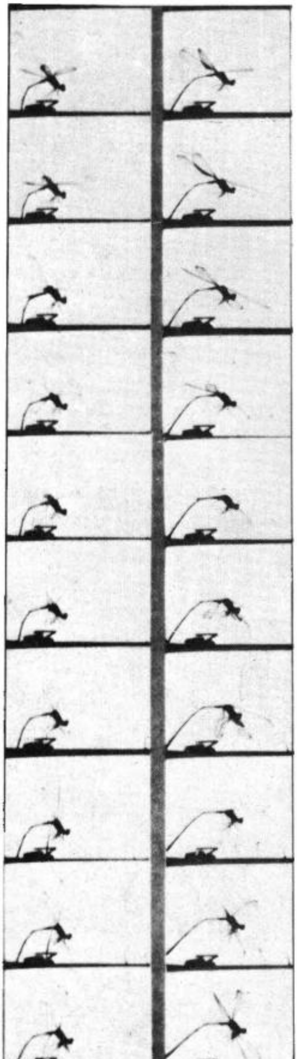

উড়ন্ত ফড়িঙের ছবি। ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে ডক্টর লুসিয়েন জি. বেল দ্রুতগতি পতঙ্গদের ধারাবাহিক ফোটোগ্রাফ তুলতে প্রথম সফল হয়েছিলেন

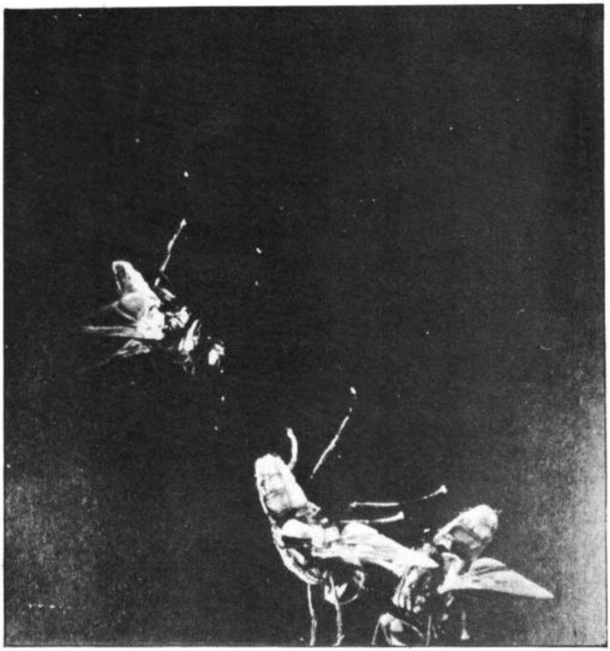

ছাতের ওপর মাছি এসে বসছে। একই নেগেটিভের মধ্যে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে, ফ্ল্যাশ-লাইটের সাহায্যে একটি মাছির এই প্রতিবিম্ব তিনটি তোলেন স্টিফেন ডালটন। ১৯৭৪ সালে তাঁকে ছবিটি তুলতে সাহায্য করেন ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার রোনাল্ড পার্কিন্স

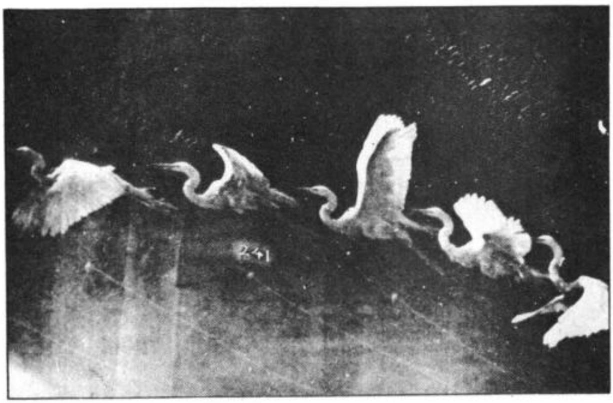

উড়ন্ত পাখি। শারীরতত্ত্ব ও পাখিদের আকাশে ওড়ার বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ফরাসি চিকিৎসাবিদ ইতেন-জুল মেরি। নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ছবি তুলে তিনি পাখিদের গতিছন্দের রহস্যভেদ করতে শুরু করেন। ছবিটি ১৮৮২ সালে তোলা

(এর পরে ৩৩ পাতায়)

অরণ্যদেব লি ফক

তুমিই সেই বামন, যে আমার একমাত্র সন্তানকে বিয়ে করবে ?
আমি ওঁর স্ত্রী হব, বাবা !
আমাদের বিয়ে বন্ধ করতে এখানে আসার দুঃসাহস হল কী করে ?
ঝাটুন খান কাউকে ভয় করে না । কিন্তু আমি বিয়ে বন্ধ করতে আসিনি ।
আমি, মঙ্গোল সম্রাট ঝাটুন খান, আমার একমাত্র সন্তানের বিয়ে এভাবে এক অপরিচিত মুখোশ-পরা লোকের সঙ্গে দেব না ।
!
!
আপনার কাছে অপরিচিত, খান ।
সমস্ত অরণ্য ওকে চেনে এবং ...
ভালবাসে ।
এরা ?
আমার ভাই । এবার চলে যান, নইলে ...
আমাকে শেষ করতে দাও । আমার মেয়ে মহান মঙ্গোল সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী । তার বিয়ে জংলিরা দিতে পারে না ।
বাবা, শোনো...
গরর্ ।
আমার জাতির শাসক হিসেবে প্রজাদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে...
5-10
এই বীর ছোট্ট মানুষটির সঙ্গে আমার একমাত্র সন্তানের বিয়ে আমিই দেব ! নতজানু হও !
!
!
আমি, ঝাটুন খান ... ভাতুন ধাতুনের শাসক, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করছি । এখন কনেকে চুম্বন করো !
(ক্রমশ)

**“গিলি গিলি গিলি গে ছু মন্তর
ক্যামলিন টেনে দেয় লাইন সুন্দর”**

ছোট্ট পাশার খাতাপত্র এত পরিষ্কার, তার রহস্য-ক্যামলিন রুলার।

ক্যামলিন রুলার সরলরেখা টানে এমন সিধেভাবে, যে দেখবে অবাক হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে পাশার হোমটাস্কও শেষ, টীচার রোজ পিঠ চাপড়ে বলেন, “বেশ, বেশ!”

camlin

সবসময়ের সঙ্গী

Contract.CL.923.93.Bn

(৩০ পাতার পর)

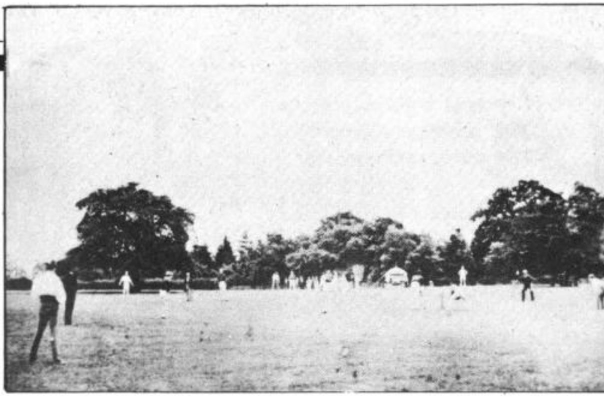

ক্রিকেট খেলার ফোটোগ্রাফ। ১৮৫৭ সালে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার রজার ফেন্টন-এর তোলা

ফুটবল টিম। ১৮৬৩ সালে গ্রেট ব্রিটেনের 'ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ফুটবল খেলার নিয়মকানুনও তারপরেই তৈরি হয়। এই নিয়মমাফিক ফুটবল খেলার অংশীদার দলগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য 'রয়েল এঞ্জিনিয়ার'-দের ১৮৬৮ সালে তোলা ছবি

মোটরগাড়ির দৌড়। ১৮৯৪ সালের ২২ জুলাই তোলা,সেদিন ভোর আটটায় প্যারিস থেকে ২১টি গাড়ি এই দৌড়ে অংশ নেয়

বক্সিং-এর ফোটোগ্রাফ। ১৮৫৫ সালে তোলা

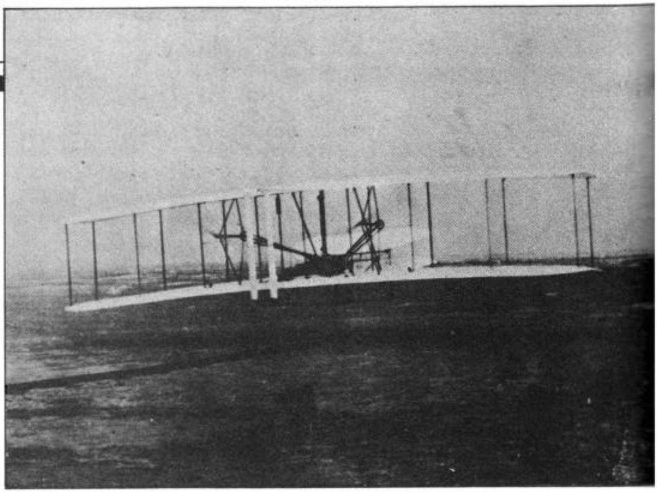

উড়ন্ত এরোপ্লেন। অরভিল ও উইলবার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম এরোপ্লেন। 'কিটি হক', প্রথমবারের মতো সদ্য মাটি ছেড়ে উঠেছে। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় ১৯০৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই ছবিটি তোলেন জন. টি. ড্যানিয়েলস

প্রথম এয়ারমেল। ১৯১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নিজের হাতে তৈরি এরোপ্লেনে ডাক বহন করে নিয়ে যান ফ্রেড ওয়াইজম্যান। ক্যালিফোর্নিয়ার পেটালুমা থেকে সান্টা রোজা অবধি মাত্র ১২ মিনিটের আকাশ পাড়ির সময়ে তোলা ছবি

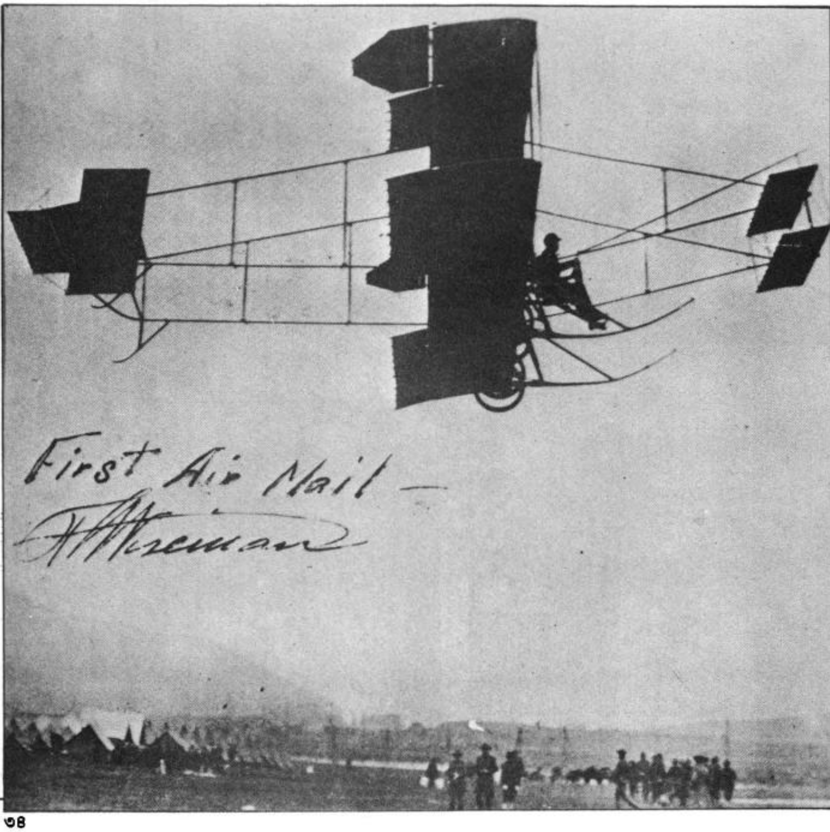

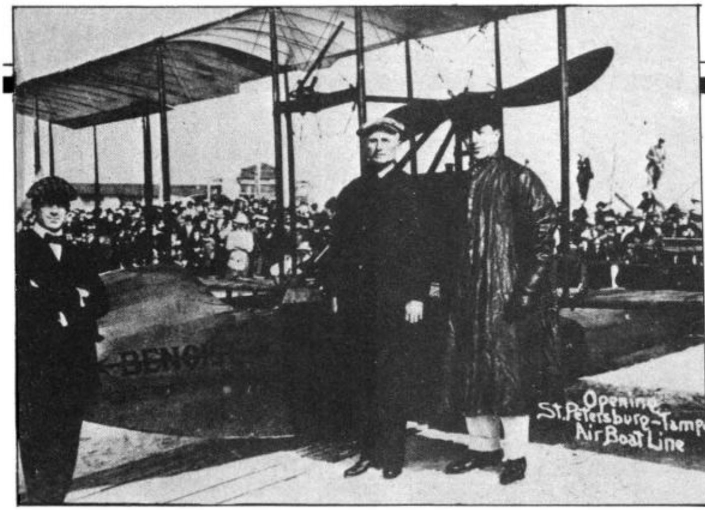

প্রথম যাত্রিবাহী এরোপ্লেন। ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি সেন্ট পিটার্সবার্গ ও ফ্লোরিডার মধ্যে প্রথম যাত্রিবাহী বিমান ব্যবস্থা চালু হয়। ছবির ডান দিকে পাইলট টনি ইয়ানুস, আর তাঁর পাশেই প্রথম যাত্রী সেন্ট পিটার্সবার্গের মেয়র

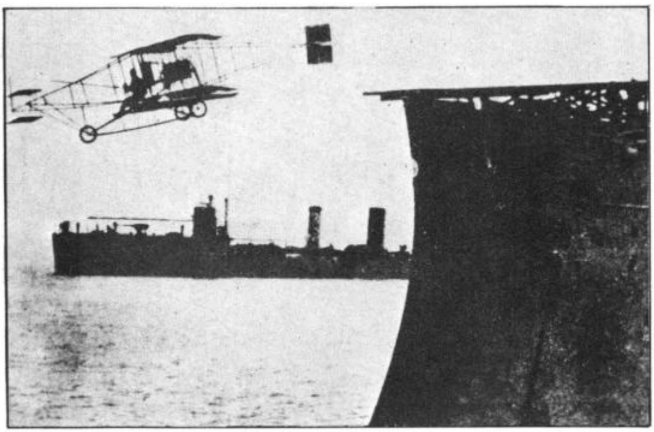

বিমানবাহী জাহাজ। ১৯১৪ সালের ১৪ নভেম্বর একটি যুদ্ধজাহাজের ডেক থেকে বিমানটির আকাশে ওঠার ছবি

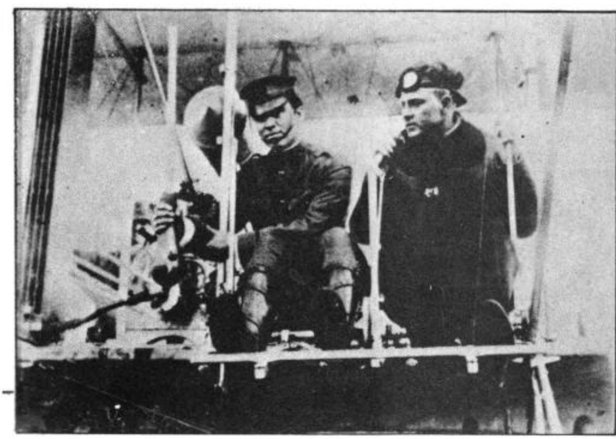

প্রথম বম্বার এরোপ্লেন। রাইট মডেল 'বি' নামক জোড়া ডানার এরোপ্লেনটির ছবি তোলা হয় ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে। স্থান, সানফ্রান্সিসকো

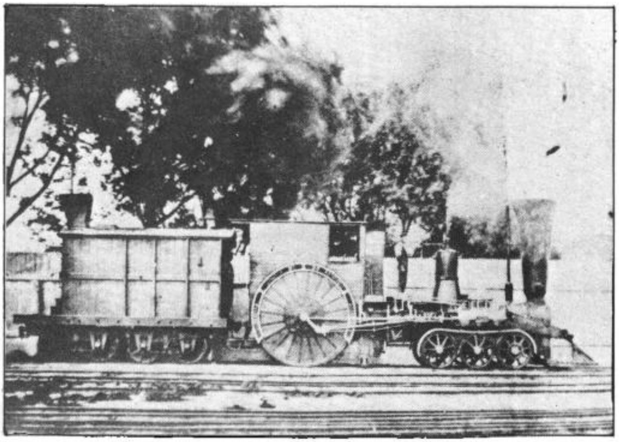

রেলগাড়ির ফোটোগ্রাফ। ১৮৫০ সালে ডব্লিউ. এবং এফ. লাঙ্গেনহাইম-এর তোলা। এর আগেও নিশ্চয় রেলগাড়ির ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় না

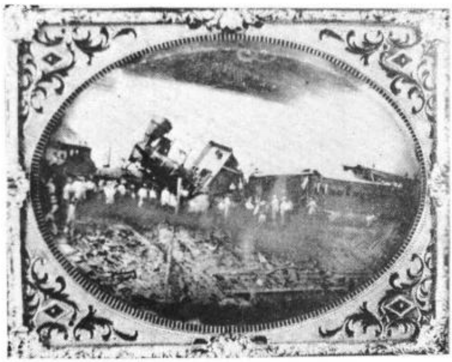

রেলপথে দুর্ঘটনা। ১৮৫৩ সালের ১২ অগস্ট রোড আইল্যান্ডে দাগেরোটাইপটি তোলেন এল. রাইট

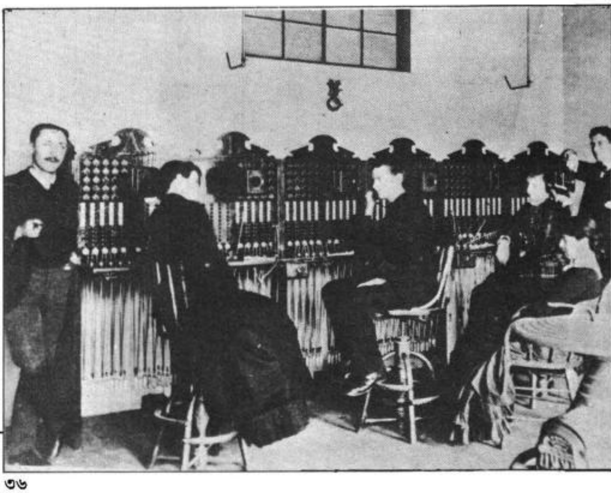

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। ১৮৭৮ সালে আমেরিকার নিউ হাভেনে প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ খোলা হয়। তার ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় না। ছবিটি ১৮৮৩ সালে বস্টনে স্থাপিত প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের

পৃথিবী থেকে চাঁদের ছবি। ১৮৫১ সালের মার্চ মাসে বস্টনের জন অ্যাডাম্‌স হুইপ্‌ল-এর তোলা দাগেরোটাইপ

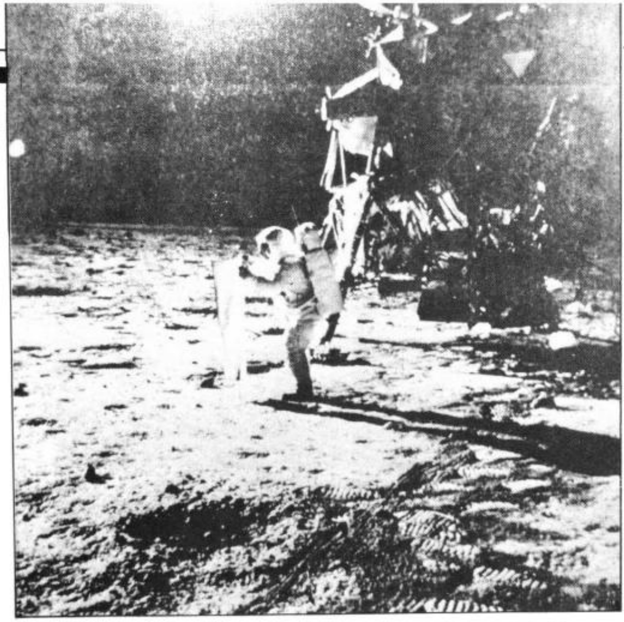

চাঁদের পিঠে মানুষ। নিল আর্মস্ট্রং ও তাঁর পায়ের ছাপ। ১৯৬৯ সালের ১০ জুলাই। অলড্রিনের তোলা

চাঁদের পিঠে পা রাখার আগের মুহূর্ত। ১৯৬৯ সালের ১০ জুলাই নিল এ. আর্মস্ট্রং 'অ্যাপোলো-১১' থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। ছবি তুলেছিলেন তাঁর সহযাত্রী এডউইন অলড্রিন

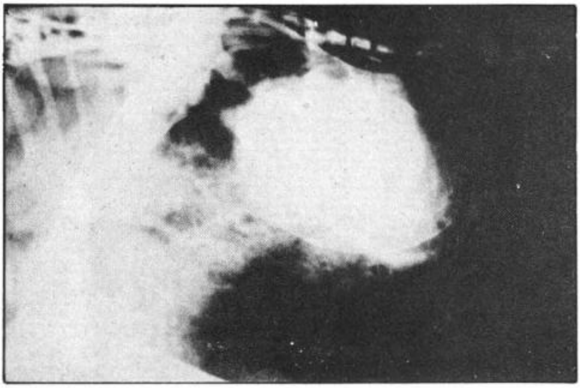

ডিম পাড়ার ছবি। এক্স-রে ফোটোগ্রাফ। ডিম তৈরির পর, নয়, সাড়ে তেইশ ও সাড়ে পঁচিশ ঘন্টার মাথায় তোলা পর-পর তিনটি ছবি। ডিম পাড়ার আগে সেটা একপাক ঘুরে যায়। ১৯৪৬ সালে ছবিগুলি তুলেছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এ. ফেয়ারফ্যাক্স ফজার্ড

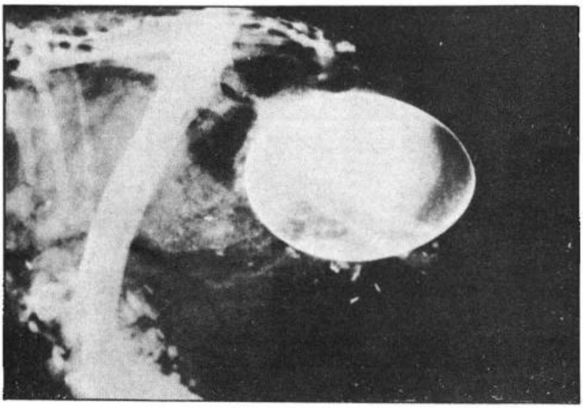

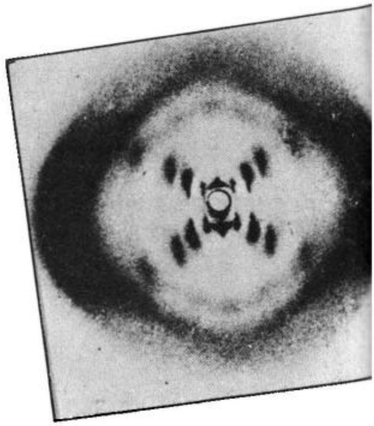

ডি. এন. এ-এর গঠন। জেনেটিক তথ্যের আধার হিসেবে ডি. এন. এ-এর গঠনের ডাব্‌ল-হেলিক্স বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার হওয়ার আগেই লন্ডনের কিংস কলেজের রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন ১৯৫২-'৫৩ সালে এই এক্স-রে ছবিটি তোলেন

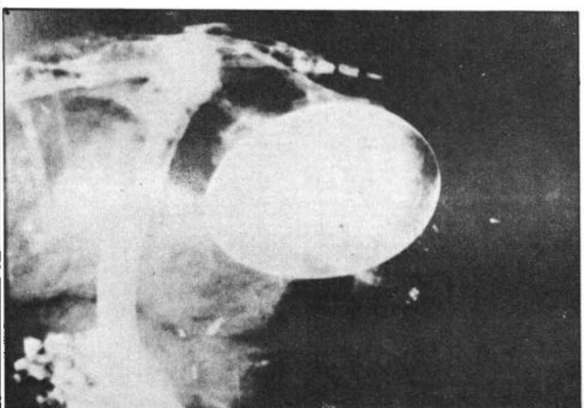

এক্স-রে। চিকিৎসার কাজে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির উপযোগিতার কথা ১৮৯৫ সালে প্রথম জানা যায়। সেই বছরেই তোলা আংটি-পরা হাতের বিখ্যাত ফোটোগ্রাফ

ভারতে প্রদর্শিত ও মুদ্রিত এক্স-রে চিত্র। ১৮৯৭ সালে ফাদার লাফোঁ ও প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ভারতের ভাইসরয় এলগিনের হাতের এই ছবিটি তোলেন

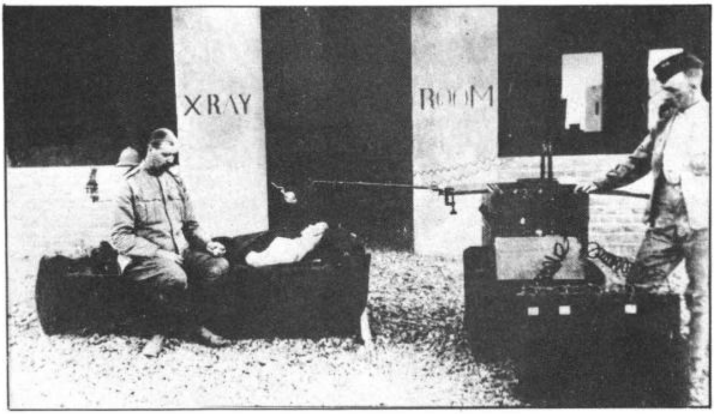

ভ্রাম্যমাণ এক্স-রে গ্রহণকারীদের ছবি। ১৮৯৮ সালে মিশরে, ব্রিটিশ সৈন্যের ছাউনিতে তোলা

অ্যানাসথেসিয়া প্রয়োগ করে শল্য চিকিৎসা। ১৮৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর ম্যাসাচুসেটস-এর হাসপাতালে তোলা

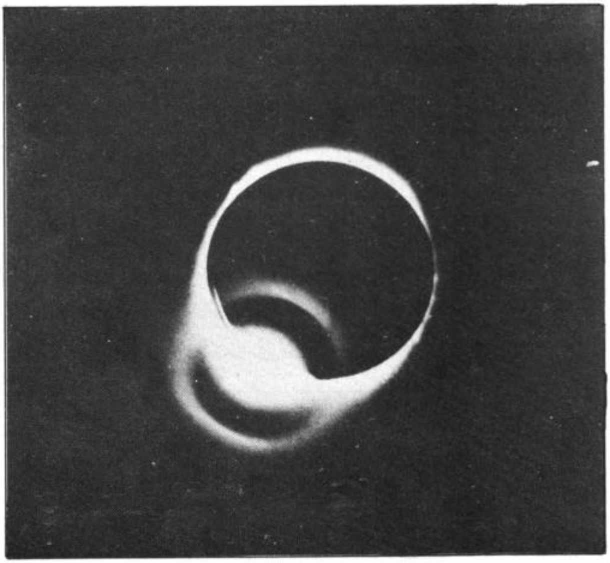

সূর্যগ্রহণ ('হীরক বলয়')।
১৮৬৯ সালে কেন্‌টাকির
শেলবিভিল থেকে তোলা

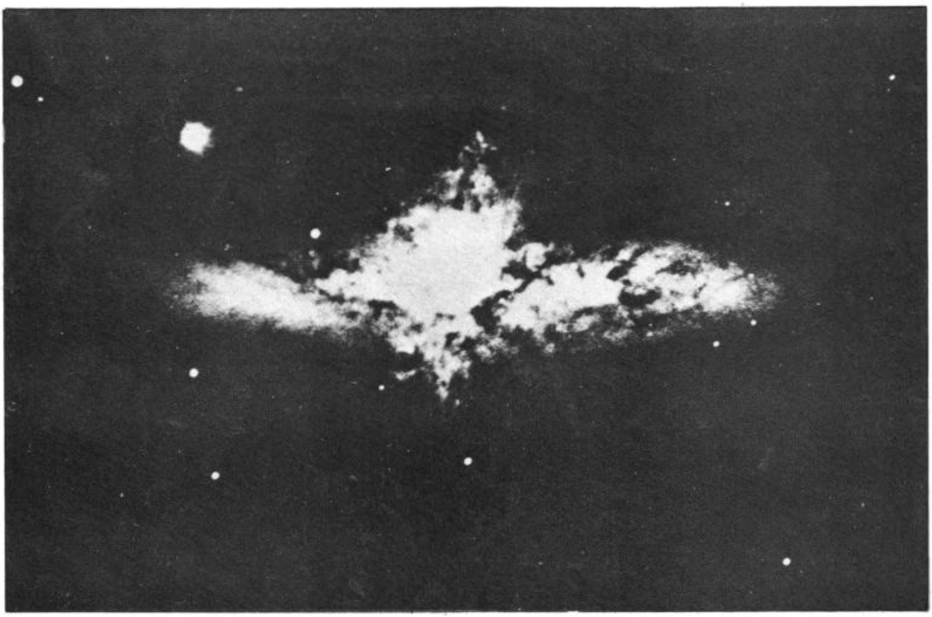

ছায়াপথের বিস্ফোরণ। ১৯৬০ সালের প্রথম দশকে মাউন্ট পালামোরের দু'শো ইঞ্চি দূরবীক্ষণের মধ্যস্থতায় তোলা মেসিয়ার-৮২ নামক নেবুলার বিস্ফোরণ

খেলামেলা

হিরো কাপ-জয়ী অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন

হিরো কাপ জিতে অনেকদিন পর ভারত একদিনের ক্রিকেটে সাফল্য পেল। পাঁচ দেশের এই টুর্নামেন্টে ভারত দু'বার হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে, ফাইনালেও প্রাধান্য রেখে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। তাই গত বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তান ও এখন একদিনের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অস্ট্রেলিয়া না থাকলেও এই জয় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। ভারতের অধিনায়ক আজহারউদ্দিন এই প্রতিযোগিতায় দারুণ সফল। দুর্দান্ত ব্যাটিং করে তিনি 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হয়েছেন। আজহার ছাড়াও বিনোদ কাম্বলির আকর্ষক ব্যাটিং, অজয় জাদেজার সফল প্রত্যাবর্তন, অনিল কুম্বলে ও শচীন তেণ্ডুলকরের কার্যকর বোলিং, কপিলদেবের অসাধারণ লড়াকু মনোভাব ভারতকে এই প্রথম দেশের মাটিতে এতবড় সাফল্য এনে দিল। রাতের ইডেন উদ্যান সি. এ. বি-র হীরক জয়ন্তী উৎসবে মেতে উঠেছিল। আনন্দ-উৎসাহে মেতে উঠেছিলেন এখানকার ক্রীড়াপ্রেমিকরাও। দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়েছিল জয়ের আনন্দে।

ফোটো : রাজীব দে

"বাড়তি যে জিনিসটা ওর চাইই চাই"
আজকাল কেবল পাল্লা দিয়ে দমবন্ধ দৌড় । জীবনের শুরুতেই সবকিছুতে টেনশন । তাই সবসময় খেয়াল রাখতে হয় মেয়েটার উপর । এত অল্পবয়েসে এত চাপ ! ওর দরকার বাড়তি পুষ্টি, বাড়তি প্রাণশক্তির জন্য । ওকে আমি তাই নিয়ম করে বোর্নভিটা দিই, যা প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল ও ক্যালসিয়ামে ভরপুর । আর ও নিজে তো বরাবরই বোর্নভিটার ভক্ত, কারণ এর চকোলেটের দারুণ স্বাদ ।
দেখুন ওকে ! স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম তিনজনের মধ্যে জায়গা ওর পাকা – আর স্কুল স্পোর্টসে ও বরাবরের চ্যাম্পিয়ন ।
হ্যাঁ, সবকিছুতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার জন্য ওর বিশেষ দরকারী জিনিসটা হল বোর্নভিটা, যা ওর চাই – প্রত্যেকদিন ।
প্রতিদিনের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিদিনের প্রাণশক্তি
Cadbury's Bournvita
বাড়তি ক্যালসিয়াম
Ogilvy & Mather 3422 BN

বর্ষসেরা খেলা ও খেলোয়াড়

এ-বছর খেলাধুলোর জগতে ঘটেছে নানা বিচিত্র ঘটনা। আলোচনা করেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

দেখতে-দেখতে শেষ হয়ে এল একটি বছর। খেলাধুলোর জগতে ঘটে গেল নানা উত্থান-পতন। অনেক 'তারকা' যেমন তাঁদের জায়গা হারিয়েছেন, তেমনই অনেকে উঠে এসেছেন সাফল্যের শীর্ষে। ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বসেরা অ্যাথলিট নিয়ে 'ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপ'। বহু রেকর্ড ভেঙে গেছে এই প্রতিযোগিতায়। ক্রিকেটের বড় আসর

অনিল কুম্বলে : ভারতের সেরা স্ট্রাইকার বোলার

বসেছে ভারতে। পাঁচ দেশের হিরো কাপে 'হিরো'-র সম্মান পেয়েছে ভারত। এ ছাড়া সারা বছর জুড়েই চলেছে নানা প্রতিযোগিতা। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা নানা ঘটনা। আমাদের উত্তেজিত এবং রোমাঞ্চিত করেছে।

ফুটবল

আগামী বছর বিশ্বকাপে কোন-কোন দেশ আমেরিকায় খেলবে তা ঠিক হল এ-বছর, দীর্ঘদিন ধরে চলা বিশ্বকাপের প্রাথমিক রাউন্ডের ম্যাচগুলিতে। সংগঠক আমেরিকা এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ান জার্মানি ছাড়া মোট ২২টি দেশ নির্বাচন করা হল এই ম্যাচগুলিতে। এই প্রথম বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল গ্রিস ও নাইজিরিয়ার মতো ছোট দেশ। বিশ্বকাপ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ছিটকে গেল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ডেনমার্ক। তার ফলে দেখা যাবে না গাসকোয়েন, পপাঁর মতো বিশ্বসেরা ফুটবলারদের খেলা। বিশ্বকাপের এই পর্বে চমক-দেওয়া ফুটবল খেলেছে কলম্বিয়া।

এখন সেরা ব্যাটস্‌ম্যান ব্রায়ান লারা
ফোটো : রাজীব দে

আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দলকে তারা হারিয়েছে পাঁচ গোলে। ব্রাজিল মোটামুটি ছন্দে ফিরেছে, আর্জেন্টিনা তেমন ভাল না খেললেও তাদের বড় লাভ দিয়েগো মারাদোনার প্রত্যাবর্তন। আগামী বিশ্বকাপের নিশ্চয়ই বড় আকর্ষণ হবেন তিনি। এ ছাড়াও মাতানোর জন্য থাকবেন কলম্বিয়ার কার্লোস ভালদেররামা, ফসটিনো আসপ্রিলা, ব্রাজিলের রোমারিও, রাই, হল্যান্ডের ডেনিস বার্গকাম্প, আর্জেন্টিনার গাব্রিয়েল বাতিস্তুতা, ইতালির রবার্তো বাজ্জিও প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই এবার চমৎকার ফুটবল খেলেছেন। বছরের সেরা ফুটবলার কে? দেশের দিক থেকে বাছতে হলে অবশ্যই কার্লোস ভালদেররামার নাম করতে হবে। কলম্বিয়াকে প্রায় একক কৃতিত্বে তিনি বিশ্বসেরা দলগুলোর অন্যতম করে তুলেছেন। 'ইতালিয়া নাইনটি'র অন্যতম সেরা ফুটবলার ছিলেন তিনি। আর এখন তাঁর মতো 'স্কিমার' বিশ্ব-ফুটবলে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ক্লাব-ফুটবলে দারুণ খেলেছেন ইতালির ফিওরেন্তিনার গাব্রিয়েল বাতিস্তুতা। এবার ভাল ফর্মে আছেন রুড গুলিটও। এ সি মিলান ছাড়ার পর নতুন

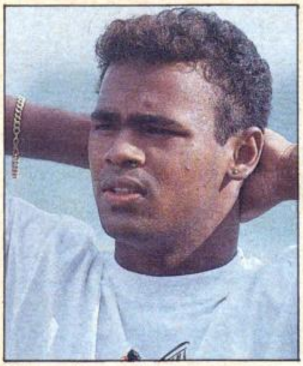

বিনোদ কাম্বলি   ফোটো : তপন দাশ

ক্লাব সাম্প্রাদোরিয়ার হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন গুলিট। এবারে একেবারেই অফ-ফর্মে ছিলেন মার্কো ভ্যান বাস্তেন এবং পল গাসকোয়েন। তবে ইংল্যান্ডে গাসকোয়েনকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের নায়ক ইংল্যান্ডের ববি মুরের মৃত্যু এ-বছরের অন্যতম দুঃখজনক ঘটনা। ঘরোয়া ফুটবলে এবার ভাল খেলেছেন বিজয়ন। চমৎকার পায়ের কাজ এবং ফ্রি কিক মারার কৌশলে বড় ম্যাচে তিনিই নায়ক হয়ে উঠেছেন। তরুণ বাইচুং ভুটিয়াও আশা জাগিয়েছেন। বিদেশের আল জাওরা ক্লাবকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে আলোড়ন তুলেছে ইস্টবেঙ্গল। সর্বভারতীয় নামীদামি টুর্নামেন্টে কলকাতার দুই প্রধান আধিপত্য দেখালেও জাতীয় ফুটবলের সিনিয়ার এবং জুনিয়ার—দুটি বিভাগেই বাংলার ব্যর্থতা এ-বছরও যথারীতি বজায় রয়েছে। আই এফ এ-র শতবর্ষে এটা মোটেই সুখের কথা নয়।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া এবং শারজায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হলেও একদিনের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর বসেছিল কলকাতায়। সি এ বি-র হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে পাঁচ দেশের হিরো কাপ ছিল উত্তেজনায় টানটান। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে শেষ বলে ভারতের জয়, জিম্বাবোয়ে-ভারতের সঙ্গে টাই ম্যাচ প্রমাণ করেছে একদিনের ম্যাচ কেন এত আকর্ষক। এই টুর্নামেন্টেই দেখা গেল জন্টি

সোনামনি'র স্বাস্থ্য ভাল রাখবেন কি করে?

কেয়ো কার্পিন বেবী অয়েল-এর ম্যাসাজ ও আপনার ভালবাসার গুণে।

ভিটামিন এ, ডি আর ই মেশানো কেয়ো কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে বাচ্চাদের মালিশ করুন — দেখুন ওরা কেমন সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে।

এই তেল, ভিটামিন ডি-র অভাবজনিত হাড়ের অস্বাভাবিকতা থেকে আপনার সন্তানকে রক্ষা করে।

ভিটামিন ই মেশানো এই তেল মাসক্যুলার ডিসট্রোফি জাতীয় অসুখ থেকে রক্ষা করে ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের ভিটামিন এ-র চাহিদা পূর্ণ করে। ফলে ত্বকের অসুখ সেরে যায়।

চন্দন, নিমতেল ও অন্যান্য উপাদানের গুণে ভরা এই তেল — শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।

ব্যবহার করে দেখুন আপনার সন্তান কেমন সারা বছর সুস্থ থাকে।

কেয়ো কার্পিন
বেবী অয়েল

Dey's® দে'জ মেডিকাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

★ এটি কোন প্রসাধনী সামগ্রী নয়

TS McCann/DMBO/293/BN

রোড্সের দুর্দান্ত ফিল্ডিং। অস্ট্রেলিয়া এবং শারজাতে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখানে জিতল ভারত। এই প্রথম ভারতের মাটিতে কোনও বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতল ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। হিরো কাপের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল, ইডেন উদ্যানে এই প্রথম ফ্লাডলাইটে দিন-রাতের খেলার ব্যবস্থা। টেস্টেও এ-বছর ভারত মোটামুটি ভাল খেলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিধ্বস্ত হয়ে আসার পর হারিয়েছে ইংল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে এবং শ্রীলঙ্কাকে। শ্রীলঙ্কাও এ-বছর ভাল খেলেছে। একদিনের সিরিজে হারিয়েছে ভারত এবং ইংল্যান্ডকে। ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও করুণ অবস্থা ইংল্যান্ডের। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা কেউই তাদের দাঁড়াতে দেয়নি। বছরের শুরুতেই একদিনের ম্যাচের উত্তেজনায় শেষ হয় অ্যাডিলেড টেস্ট। চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক রানে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে। সবচেয়ে কম রানে জয়ের নজির এটি। বছরের সেরা ফিল্ডার নিঃসন্দেহে জন্টি রোড্স, কিন্তু সেরা বোলার ও ব্যাটসম্যান কে ? বেশ কয়েকটি ভাল ইনিংস খেলা ছাড়াও ভারতের বিনোদ কাম্বলি পরপর দুটি টেস্টে ডবল সেঞ্চুরি করে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বরেকর্ড করেন। কৃতিত্বের অবশ্যই। তবে ধারাবাহিক ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়ে সেরার সম্মান পেতে পারেন আর এক বাঁ-হাতি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা। এ-বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাফল্যের প্রধান কৃতিত্ব তাঁর। আর-একজনের কথাও বলতে হবে, কার্টলে অ্যামব্রোজ পার্থে এক রানে অস্ট্রেলিয়ার সাতটি উইকেট নিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই দীর্ঘদেহী পেসার ছাড়া আর কে হবেন বছরের সেরা বোলার ! অ্যালান বর্ডার এ-বছরই সুনীল গাওস্করের ১০,১২২ রানের রেকর্ড ভেঙে দিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে তিনি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহকারী। ক্রিকেটে এ-বছর পাওয়ার চেয়ে হারানোর সংখ্যাই বেশি। সেরা কয়েকজন ক্রিকেটার অবসর নিলেন এ-বছর, ইয়ান বোথাম, ভিভ রিচার্ড্স, ম্যালকম মার্শাল, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত এবং সবশেষে ডেভিড গাওয়ার। এঁরা শুধু পারফরম্যান্সের বিচারেই দুর্দান্ত ছিলেন না, ক্রিকেট যে আজ এত প্রাণবন্ত, আকর্ষক তা দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণ করে গিয়েছেন এঁরাই। শতবর্ষ পূর্ণ করে মারা গেলেন যশস্বী

বিজয়ন

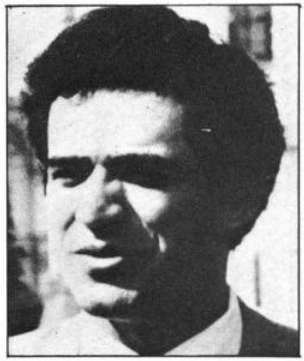

কাসপারভ

ক্রিকেটার ডি বি দেওধর।

টেনিস

এ-বছরের সেরা টেনিস প্লেয়ার ২২ বছরের পিট সাম্প্রাস। তিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ শুধু এক নম্বরই নন, দক্ষতাতেও তিনি এগিয়ে আছেন। দুটি 'গ্র্যান্ড স্লাম' উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেন প্রতিযোগিতায় সাম্প্রাস জিতেছেন এবার। তাঁর দুর্দান্ত সার্ভিস, সারা কোর্ট জুড়ে খেলার দক্ষতা ও বৈচিত্র্যময় শট তাঁকে করে তুলেছে বিশ্বসেরা। জিম কুরিয়ার কিছুদিন এক নম্বরে থাকলেও দক্ষতায় তাঁর স্থান সাম্প্রাসের পরে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এবার এক নম্বরে স্টেফি গ্রাফের স্থান। এ-বছর ফর্মের তুঙ্গে আছেন স্টেফি। তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম, ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেন জিতেছেন। অবশ্য তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোনিকা সেলেস খেললে কী হত বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, ১৯ বছরের এই যুগোস্লাভ তরুণীকে বছরের বেশিরভাগ সময় কোর্টের বাইরে কাটাতে হল। গুন্টার পার্চ নামে এই 'ভক্ত' সেলেসকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন হামবুর্গে এক টুর্নামেন্ট চলার সময়। টেনিস খেলোয়াড়ের ওপর এই ধরনের আক্রমণ এই প্রথম। ডেভিস কাপে ভারত এবার দারুণ খেলেছে। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো দুর্দান্ত দলকে হারিয়েছে

এখনও ফুরিয়ে যাননি মারাদোনা। যে-কোনও মুহূর্তে বিপক্ষ-দলের 'ডিফেন্স' ভেঙে এগিয়ে যেতে পারেন তিনি। বাতিস্তুতার সঙ্গে চমৎকার একটা বোঝাপড়াও তিনি গড়ে তুলেছেন। বিশ্বকাপ ফুটবলে বিপজ্জনক জুটি মারাদোনা-বাতিস্তুতা

ডেভিড গাওয়ার

ভিভ রিচার্ডস

ইয়ান বোথাম

ডেরেক প্রিঙ্গল

ম্যালকম মার্শাল

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

ক্রিকেট মাঠের বর্ণময় চরিত্রগুলি একে একে বিদায় নিচ্ছেন। ব্রায়ান লারা, বিনোদ কাম্বলি ও শচীন তেন্ডুলকরের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এসে পড়েছেন। লারা তো ইতিমধ্যেই 'সুপারস্টার'। অন্যদিকে, বাস্কেটবলের কিংবদন্তি মাইকেল জর্ডনও অবসর নিয়েছেন। খেলাধুলোর জগতে ১৯৯৩ চিহ্নিত হয়ে থাকবে 'অবসরের বছর' হিসেবে।

ভারত। নেতৃত্বে ছিলেন কলকাতার তরুণ ২০ বছরের লিয়েণ্ডার পেজ। লিয়েন্ডারের অদম্য উৎসাহ ও লড়াকু মনোভাব এবং রমেশ কৃষ্ণনের বিচক্ষণতার ফলে ভারত সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

অ্যাথলেটিক্স

স্টুটগার্টে এবারের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বহু বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেছে। আভিজাত্য ও গৌরবে এই প্রতিযোগিতা ওলিম্পিকের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ১০০ মিটার দৌড় জিতে 'দ্রুততম'-র সম্মান পান ব্রিটেনের ৩২ বছরের লিনফোর্ড ক্রিস্টি। এই বয়সেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন ব্রিটেনের 'স্যালি গানেল, ১১০ মিটার হার্ডলসে বিশ্বরেকর্ড করেন কলিন জ্যাকসন। রেকর্ড আরও হয়েছে, তবে এবার চিনের মহিলারা অবিশ্বাস্য সাফল্য পেয়েছেন। তাঁরা যেভাবে দ্রুত উঠে আসছেন তা অবাক করারই মতো। সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট হিসেবে স্বীকৃত কার্ল লুইসের এ-বছরটা তেমন ভাল কাটেনি। তবে লুইসের মতো প্রতিভা যে-কোনও সময়েই ফর্মে ফিরতে পারেন।

অন্যান্য খেলা

দাবায় এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়েছেন দু'জন। সরকারি স্বীকৃতি অনুসারে আনাতোলি কারপভ, অস্বীকৃত চ্যাম্পিয়ান গ্যারি কাসপারভ। কাসপারভ এবং নাইজেল শর্টের লড়াইকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি। স্কোয়াশে ৫০তম টুর্নামেন্ট জিতে জানশের খান আবার প্রমাণ করেছেন তিনিই এখন বিশ্বে এক নম্বর। বাস্কেটবলের কিংবদন্তি আমেরিকার কোটিপতি খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডন এ-বছর অবসর নিয়েছেন। খেলা ছাড়লেন বিশ্বখ্যাত কার-রেসার ফ্রান্সের অ্যালান প্রস্টও। হকিতে ভারতের পরাজয় অব্যাহত রয়েছে। এবার এশীয় হকিতেও তারা দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে দ্বিতীয় হয়েছে। তবে আনন্দের খবরও আছে, এশীয় জুনিয়ার দাবায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন বাংলার মেয়ে সহেলি ধর। বিশ্ব বিলিয়ার্ডসে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ান হলেন ভারতের গীত শেঠি। গীত এখন বিশ্বে এক নম্বর। এ-খবর তো আমাদের কাছে খুশিরই।

টেনিসে যাঁরা উঠে আসছেন

টেনিসে সেরা খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন যেসব তরুণ, তাঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে লিখেছেন **প্রতাপ জানা**

গত বছর চারটি প্রধান টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ ভাগ করে নিয়েছেন তিনজন। অস্ট্রেলিয়া ওপেন জিতেছেন জিম কুরিয়ার, ফরাসি ওপেন— সের্গেই ব্রুগুয়েরা, উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেনে বাজিমাত করেছেন পিট সাম্প্রাস। পারফরম্যান্সের বিচারে ২২ বছর বয়সী মার্কিন তারকা পিট সাম্প্রাস নিজেকে যে বিশ্বসেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ টি পি (অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস প্রফেশনাল্‌স) র‍্যাঙ্কিং-এ প্রথম স্থান এখন পিট সাম্প্রাসেরই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মাইকেল স্টিখ এবং তৃতীয় স্থানে জিম কুরিয়ার। এর চেয়েও বড় কথা, এখনকার টেনিসে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ১৫ জনের মধ্যে তফাতটা এত কম যে, এঁদের মধ্যে বিশেষ দিনে যে কেউই জিততে পারেন। লেন্ডলের দিন আগেই শেষ হয়েছে, বেকারের দিনও প্রায় শেষ। সাম্প্রাস, কুরিয়ার, আগাসি, স্টিখ ও এডবার্গদের রাজত্বে যাঁরা শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে উঠেছেন বা উঠছেন, তাঁদের মধ্যে ইউক্রেনের আন্দ্রেই মেদ্‌ভেদেভ, ফ্রান্সের সেড্রিক পাওলিন, হল্যান্ডের রিচার্ড ক্রাইজেক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মলিভাই ওয়াশিংটন, চেকোস্লোভাকিয়ার পিটার কোর্দা ও ক্রোয়েশিয়ার গোরান ইভানেসেভিচের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

এ টি পি সার্কিটে মেদভেদেভের উত্থান ঘটেছে অনেকটা উল্কার গতিতে। গত বছরই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ২২৬ নম্বর থেকে উঠে আসেন ২৪ নম্বরে। মার্চে ২১ নম্বরে এবং এখন তাঁর স্থান প্রথম ১০ জনের মধ্যে। অগ্রগতির চিহ্নও স্পস্ট। গ্র্যান্ড স্লামের অন্তর্ভুত চারটি প্রধান টেনিস টুর্নামেন্টের মধ্যে দুটিতে— ফরাসি ওপেন ও ইউ এস ওপেনে এবার তিনি ভাল ফল করেছেন। ফরাসি ওপেনে তিনি পৌঁছে ছিলেন শেষ চারজনের মধ্যে এবং ইউ এস ওপেনে শেষ আটজনের মধ্যে। এরপর রানার্সের সম্মান পেয়েছেন প্যারিস ওপেনে।

টমাস মাস্টার

কিয়েভ শহরের ছেলে আন্দ্রেই মেদভেদেভ দারুণ চমক তৈরি করেছিলেন গত বছর স্টুটগার্ট ওপেনে। খেতাব জয় করার পথে মেদভেদেভ তখন একে-একে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, স্তেফান এডবার্গ, ওয়েন ফেরিরা, টমাস মাস্টার ও এমিলিও সানচেজের মতো নামী তারকাদের চ্যালেঞ্জ। পার্থে অনুষ্ঠিত হপম্যান কাপের খেলায় মেদভেদেভ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছিলেন মাইকেল স্টিখকে। ১৯ বছর বয়সী, ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা আন্দ্রেই মেদভেদেভ প্রধানত আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়। নিজেকে 'সার্ভ অ্যান্ড ভলি' গেমের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসেবে ভাবতে তিনি বেশি পছন্দ করেন, যদিও তুলনামূলকভাবে তাঁর সাফল্য বেশি এসেছে ক্লে কোর্টে। বেসলাইন থেকে কিংবা নেটের কাছে, যেখান থেকে তিনি খেলুন না কেন—সব সময় তাঁর র‍্যাকেটে ধরা থাকে আক্রমণাত্মক মেজাজ। বিশেষজ্ঞরা এখন মেদভেদেভের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রাক্তন চেক-তারকা 'অল কোর্ট প্লেয়ার' মিলোস্লাভ মেচিয়ারের ছায়া। নিজের ছেলেবেলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেদভেদেভ বলেছেন, "আমি অঙ্কের ভাল ছাত্র ছিলাম, কিন্তু ক্লাসে বেশি সময় থাকতে চাইতাম না। মহাকাশচারী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এজন্য যে স্বাস্থ্য থাকা দরকার, তা আমার ছিল না।" মহাকাশচারীর মতো তাঁর স্বাস্থ্য থাকুক অথবা নাই থাকুক, টেনিস-খেলোয়াড়ের আদর্শ স্বাস্থ্য যে মেদভেদেভের রয়েছে, এ-নিয়ে সন্দেহ নেই। আন্দ্রেই মেদভেদেভের বোন নাতালিয়ারও কিছুটা সুনাম রয়েছে মেয়েদের সার্কিটে। মেদভেদেভরা এখন বিশ্ব টেনিস মানচিত্রে ইউক্রেনকে জায়গা করে দিয়েছেন।

আর ফরাসি তারকা সেড্রিক পাওলিন বয়সের তুলনায় ফুটে উঠেছেন একটু দেরিতে। ২৪ বছর বয়সী পাওলিন এবার একের-পর-এক অঘটন ঘটিয়ে পৌঁছেছিলেন ইউ. এস. ওপেনের ফাইনালে। ফাইনালে পিট সাম্প্রাসের বিস্ফোরক টেনিসের সামনে পড়ে তাঁকে রানার্সের সম্মান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলেও টুর্নামেন্টে পাওলিন কিন্তু উপহার দিয়েছিলেন দুর্দান্ত টেনিস। হারিয়েছিলেন শীর্ষ বাছাই জিম কুরিয়ার সহ আন্দ্রেই মেদভেদেভ, ওয়ালি মাসুর ও ম্যাট্স ভিল্যান্ডারের মতো নামকরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের। ৬১ বছর পরে এই প্রথম একজন ফরাসি খেলোয়াড়কে দেখা গেল ইউ এস ওপেনের ফাইনালে খেলতে। এ টি পি সার্কিটে কোনও টুর্নামেন্ট না-জেতা সত্ত্বেও পাওলিন কিন্তু উঠে এসেছেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১৫ জনের মধ্যে। অদ্ভুত ও মজার পারফরম্যান্স। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক ভাল খেলার সুবাদে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ঘটেছে তাঁর এই চমৎকার উত্থান। ফ্রান্সের এক নম্বর খেলোয়াড় এখন তিনিই। এই বছরের গোড়ায় এডবার্গ ও ইভানেসেভিচকে হারিয়ে পাওলিন উঠেছিলেন মন্টি কার্লো ওপেনের ফাইনালে। উইম্বলডনে হারিয়েছিলেন মেদভেদেভকে।

খাঁটি অ্যাথলিটের মতো শরীর সেড্রিক পাওলিনের। ছ' ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সেড্রিক পাওলিন কোর্টের মধ্যে 'অল রাউন্ড' দক্ষতার অধিকারী। ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ড, দুটিতেই সমান পারদর্শী তিনি। বিশেষ করে তাঁর ব্যাকহ্যান্ড দারুণ শক্তিশালী। সার্কিটে আক্রমণাত্মক খেলাই তাঁর বেশি পছন্দ। পাওলিনের খেলায়, সত্যি কথা বলতে কী, খুঁত বের করা মুশকিল। অর্থাৎ 'কমপ্লিট প্লেয়ার' বলতে যা বোঝায় সেড্রিক পাওলিন হলেন ঠিক তাই। স্বদেশের টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মতান্তর হওয়ার কারণে পাওলিন ভারতের বিপক্ষে ডেভিস

সেড্রিক পাওলিন

সের্গেই ব্রুগুয়েরা

আন্দ্রেই মেদ্‌ভেদেভ

কাপ দলে সুযোগ পাননি।
সত্তর দশকের নামকরা খেলোয়াড় টম ওক্কারের পর হল্যান্ড ওরফে নেদারল্যান্ডস রিচার্ড ক্রাইজেকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত বিশ্বমানের একজন তারকাকে। এ টি পি সার্কিটে ক্রাইজেক প্রথম চমক সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৯২ সালের অস্ট্রেলিয়া ওপেনে। কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়ে ছিলেন সেবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান, জার্মানির মাইকেল স্টিখকে। সেমি ফাইনালে অবশ্য তিনি জিম কুরিয়ারকে ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন পায়ের আঘাতের জন্য। সেই থেকে ২২ বছর বয়সী, 'বিগ সার্ভার' রিচার্ড ক্রাইজেক সার্কিটে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত। এ-বছর পৌঁছে ছিলেন ফরাসি ওপেনের সেমি ফাইনালে। এ টি পি র‍্যাঙ্কিংয়ে আছেন বিশ্বের প্রথম সাতজনের মধ্যে।

রিচার্ড ক্রাইজেক আদপে চেক।
চেকোস্লোভাকিয়া থেকে তাঁর বাবা-মা চলে আসেন হল্যান্ডে। বাবা ক্লাব পর্যায়ে ভালই টেনিস খেলতেন। বাবার হাত ধরেই ঢুকেছিলেন তিনি টেনিস কোর্টে। খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। মাত্র ছ' বছর বয়সে জাতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জেলা চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘদেহী রিচার্ড ক্রাইজেক মূলত 'সার্ভ অ্যান্ড ভলি' গেমের প্লেয়ার। বল মারেন খুব জোরে। তুলনায় তাঁর ব্যাকহ্যান্ড অবশ্য কিছুটা কমজোরি।
২৩ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ মলিভাই ওয়াশিংটনের মধ্যে এখন অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন আর্থার অ্যাশের ছায়া। মলিভাই ওয়াশিংটন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান খেলোয়াড়। ১৯৯২-এ জয় করেন প্রথম দুটি গ্রাঁ প্রি খেতাব মেমফিস ও চারলোটিতে। উঠে আসেন র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১১ জনের মধ্যে। মলিভাই ওয়াশিংটন বেস লাইনের দক্ষ খেলোয়াড়। প্রকৃত অ্যাথলিটের শরীর তাঁর। দৈহিক ক্ষমতা এবং লম্বা পায়ের জোরে কোর্টের মধ্যে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতির অধিকারী তিনি।
কোর্ট-কভারেজ তাঁর অসম্ভব ভাল। দৈহিক ক্ষমতা বজায় রাখতে তিনি দৌড়ন প্রত্যহ দু' মাইল। ওয়েট ট্রেনিং করেন।
জিমনাসিয়ামে অনুশীলনও করেন।
উইলিয়াম ও ক্রিস্টিন ওয়াশিংটনের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় মলিভাই ওয়াশিংটন। বাবা-মা'র প্রেরণাতেই তাঁর টেনিসে হাতেখড়ি। বাবা উইলিয়ামই হচ্ছেন তাঁর প্রথম কোচ। ১৯৮৯-তে, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে মলিভাই পেয়েছিলেন 'বর্ষসেরা কলেজ প্লেয়ার'-এর সম্মান। আমেরিকান নিগ্রো পরিবার বলতে দারিদ্র্যজর্জরিত যে অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনটি ছিলেন না ওয়াশিংটন পরিবার। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, কঠোর পরিশ্রম করে উইলিয়াম ও ক্রিস্টিন ওপর তলায় উঠে এসেছেন। সেই সুবাদে মনের মতো করে মানুষ করেছেন ছেলেমেয়েদের। বিশেষ করে মলিভাইকে।
ডান-হাতি খেলোয়াড়দের ভিড়ে যে দু'জন বা-হাঁতি খেলোয়াড় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন, তার মধ্যে একজন গোরান ইভানেসেভিচ, আর একজন পিটার কোর্দা। টেনিস- বিশেষজ্ঞদের মতে, টেনিস খেলায় ন্যাটা খেলোয়াড়রা কিছুটা বিশেষ ধরনের সুবিধে পান। বাঁ-হাতি খেলোয়াড়দের বেশির ভাগেরই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি আয়ত্তে আসে কোর্টের বাঁ দিক থেকে। তাঁদের কৌশল হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর সার্ভ ফেরত পাঠিয়ে দ্রুত নেটের সামনে দৌড়ে আসা এবং জোরালো ফোরহ্যান্ড শট মেরে পয়েন্ট আদায় করা। ইভানেসেভিচের অস্ট্রেলিয়ান কোচ বব ব্রেট এ-সম্পর্কে বলেছেন, "এই সঙ্গে বাঁ-হাতি খেলোয়াড়রা যদি বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে পারে, হাতে যদি দুরন্ত সার্ভিস থাকে, তা হলে তাকে থামানো প্রায় দুঃসাধ্য।" স্ট্রোক প্লেয়ার ইভানেসেভিচের খেলা নিখুঁতভাবে দেখার পর ব্রেট যে এমন মন্তব্য করেছেন, এ-কথা এখন না বললেও চলে। আগুনে 'বুমবুম' সার্ভিস-ই হচ্ছে ইভানেসেভিচের প্রধান ও মারাত্মক অস্ত্র। প্যারিস ওপেনে ২৭টি 'এস' সার্ভিস করে ফাইনালে এবার মেদভেদেভের বিপক্ষে তিনি সহজে জিতেছেন খেতাব।
১৯৮৯ সালের অস্ট্রেলিয়া ওপেন থেকে ইভানেসেভিচের খ্যাতি পাওয়া শুরু। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭। ১৯৯২-তে উইম্বলডনে পেয়েছিলেন রানার্সের সম্মান। ওই বছরই জিতে নেন চারটি এ টি পি খেতাব,অ্যাডিলেড,স্টুটগার্ট, সিডনি ও স্টকহোম-এ। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন আছেন পাঁচ নম্বর স্থানে। বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় পিট সাম্প্রাসের কথায়, "গোরানের দিনে ওর মোকাবিলা করা শক্ত।"
পিটার কোর্দা চেকোস্লোভাকিয়ার টেনিস ফেডারেশনের 'প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম'-এর ফসল। এখন পর্যন্ত পিটার কোর্দার বড় কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯৯২ সালে ফরাসি ওপেনে রানার্স হওয়া। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ১৮৮ থেকে উঠে আসেন ৫৯ নম্বর স্থানে। ১৯৯০-এ ৩৮ নম্বরে। এখন রয়েছেন ক্রমপর্যায় তালিকায় প্রথম ১৫ জনের মধ্যে। এ কথা ঠিক যে, ২৫ বছর বয়সী পিটার কোর্দা তাঁর প্রতিভার তুলনায় সাফল্য পেয়েছেন কমই। কোচ জেডনির্কের কথায়, "ও প্রতিভাধর ঠিকই, তবে শৃঙ্খলা মানে না। ঠিকমতো প্র্যাকটিসও করে না।" কোর্দা 'অলরাউন্ড অ্যান্ড অল কোর্ট' প্লেয়ার-ই। তাঁর খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট। কখনও খুব উজ্জ্বল, আবার কখনও নিষ্প্রভ।
এই ছ'জন ছাড়া বিশ্ব টেনিস সার্কিটে চমক সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে অস্ট্রিয়ার টমাস মাস্টার, চেকোস্লোভাকিয়ার ক্যারল নোভাচেক, জার্মানির মার্ক গোয়েলনার, স্পেনের সেগেই ব্রুগুয়েরা ও কার্লোস কোস্টা-র।
ভবিষ্যতে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ টেনিস কোর্টে ঝড় তুলবে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এই বছরটা গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনির খুব খারাপ গেল। কোনও বড় টুর্নামেন্টে জয় তো দূরের কথা, মনে রাখার মতো কোনও ম্যাচও খেলতে পারেননি তিনি। মোনিকা সেলেসের অনুপস্থিতিতে আশা করা গিয়েছিল তিনি স্টেফি গ্রাফকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে ফেলবেন। কিন্তু স্টেফির ধারেকাছে যেতে পারেননি তিনি। গত বছর ইতালিয়ান ওপেন জেতার পর আর কোনও টুর্নামেন্ট জেতেননি সাবাতিনি। প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এ তিন থেকে নেমে তিনি এখন ছয়-এ চলে এসেছেন। আগামী মরসুমটাও যাতে এরকম খারাপ না যায়, সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে চান সাবাতিনি। সে কারণেই তিনি প্রখ্যাত প্রাক্তন খেলোয়াড় গিলারমো ভিলাসকে তাঁর কোচ হতে অনুরোধ করেছেন। ভিলাস যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসি ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ান। ৪১ বছর বয়সী ভিলাস আর্জেন্টিনা ডেভিস কাপ দলের কোচ। সাবাতিনির আশা, ভিলাস তাঁকে চ্যাম্পিয়ান হতে সাহায্য করবেন।

আগামী আটলান্টা ওলিম্পিকে মহিলাদের জয়জয়কার। সেখানে যোগ দিচ্ছেন ৩৬১৭ জন মহিলা। সংখ্যাটা গত বার্সিলোনা ওলিম্পিকের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। মহিলা খেলোয়াড়দের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ, আটলান্টায় দুটি নতুন খেলা যুক্ত হচ্ছে মহিলা বিভাগে। সফ্‌ট বল এবং ফুটবল। আটলান্টা ওলিম্পিক কমিটির মুখপাত্র বরার্ট ব্রেনেন জানিয়েছেন, "এই দুই নতুন খেলা যুক্ত হওয়ায় আশা করছি, ওলিম্পিক আরও আকর্ষক হয়ে উঠবে।" প্রসঙ্গত বলা যায় যোগদানকারীর সংখ্যায় এটা একটা রেকর্ড হতে চলেছে। এর আগে কোনও ওলিম্পিকেই এত মহিলা যোগ দেননি।

❑

আন্তর্জাতিক অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন এ-বছরের সেরা পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে নির্বাচিত করেছেন ব্রিটেনের কলিন জ্যাকসন এবং সালি গানেলকে। ১১০ মিটার হার্ড্‌লসে তিনি এবারের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপে বিশ্বরেকর্ড করেন। চার বছর আগে আমেরিকার রজার কিংডমের গড়া রেকর্ড তিনি ভাঙেন। একই প্রতিযোগিতায় বিশ্বরেকর্ড করেন ব্রিটেনের 'দ্য গোল্ডেন গার্ল' গানেল ৪০০ মিটার হার্ড্‌লসে।

বিচারকদের রায়ে বছরের সেরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অ্যাথলিট হয়েছেন যথাক্রমে আলজিরিয়ার নৌরুদ্দিন মোরসেলি ও ব্রিটেনের লিনফোর্ড ক্রিস্টি। মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সম্মান পেয়েছেন চিনের ওয়াং জুনজিয়া ও গেইল ডেভার্স।

বিশ্বকাপ ফুটবলের আর দেরি নেই। ফাইনাল পর্যায়ে যে ২৪টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের প্রত্যেকেরই প্রস্তুতি এখন প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায়। প্রচণ্ড 'টেনশনে' রয়েছেন সংশ্লিষ্ট ফুটবলার, কর্মকর্তারা। কিন্তু সকলের চিন্তাভাবনাকে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছেন এক ভদ্রলোক। বিশ্বকাপের ছ' মাস আগে থেকেই নিদ্রাহীন রাত কাটাতে শুরু করেছেন তিনি। তাঁর নাম এড বেস্ট, আমেরিকা-বিশ্বকাপে নিরাপত্তার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর। বেস্ট ইতিমধ্যে প্রায় সারা বিশ্ব চষে ফেলেছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন কোয়ালিফাইং ম্যাচগুলোতে উপস্থিত দর্শকদের মেজাজ-মর্জি। দর্শকদের বসানো হয়েছে কতটা ব্যবধানে, কীভাবে দু' দলের সমর্থকদের আলাদা করা হয়েছে, প্রিয় দল জিতলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া কীরকম, হারলেই বা কী করেন তাঁরা—এ সবই নোট করে নিয়েছেন বেস্ট। বেস্টের মতে, আমেরিকায় ফুটবল নিয়ে মাতামাতি না থাকায় সেখানে মারপিটও খুব একটা হয় না। তবে কয়েকটি দেশের সমর্থকরা যে রীতিমত উত্তেজনা ছড়ান, সে-ব্যাপারে তাঁরা সচেতন। এইজন্যই কঠোর ও নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা নিতে চান তাঁরা। বেস্ট আশাবাদী, কোনও ঝামেলা করতে দেবেন না তিনি ও তাঁর দলবল, ন'টি শহরের ৫২টি ম্যাচে। এড বেস্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, ইংল্যান্ড ফাইনাল রাউন্ডে না পৌঁছনোয়। তিনি বলেছেন, "গাসকোয়েনদের খেলা দেখতে না পাওয়া দুঃখজনক ঠিকই, কিন্তু ওঁরা আমেরিকায় না আসতে পারায় আমরা খুশি। কারণ, ওঁদের সমর্থকরা মাঠকে মনে করেন যুদ্ধক্ষেত্র। ওঁদের সামলাতে আমাদের খুব অসুবিধে হত।"

ব্রিটেনের বিশ্বখ্যাত অ্যাথলিট লিনফোর্ড ক্রিস্টি ভাল গান গাইলেও পপ স্টার হতে চান না। কারণ, দৌড়নোয় তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কার্ল লুইসও গানের রেকর্ড বের করেছেন, আর আমেরিকানদের মোটেই পছন্দ করেন না ক্রিস্টি। সুতরাং আমেরিকান লুইস যা করবেন, তা করতে মোটেই ইচ্ছুক নন ৩৩ বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ক্রিস্টি। সম্প্রতি তিনি প্যারিসে প্রখ্যাত গায়ক স্পেনসার ডেভিসের 'কিপ অন রানিং' রেকর্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর আরও বক্তব্য, "আমি যে কাজ করি সেটাতেই সেরা হতে চাই। কিন্তু গানের ব্যাপারে জানি, মাইকেল জ্যাকসনের চেয়ে ভাল গাইতে আমি পারব না। সেইজন্যই গান গাওয়াকে আমি নিছক মজা হিসেবেই দেখতে চাই। এর বেশি কিছু নয়।"

আমাদের দেশের ফুটবলের মান নিয়ে আমরা যতই বিরক্ত হই না কেন, বিশ্ব-ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফার এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ফুটবলের মান বেশ উন্নত হয়েছে! ফিফা-কোকা কোলা ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং-এর সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা গেল, ভারতীয় দল বিশ্ব-ক্রমপর্যায়ে এখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ১৯৯২-এর শেষে ভারতের স্থান ছিল ১৪৩তম। এ-বছরের অক্টোবর মাসে ভারতের স্থান ১০০তম। বাংলাদেশ গত বছর ভারতের আগে থাকলেও এ-বছর পিছিয়ে পড়েছে, তাদের স্থান এখন ১২১তম। সকলের শীর্ষে আছে ব্রাজিল। দ্বিতীয় নরওয়ে, তৃতীয় ইতালি। প্রথম দশের বাকি সাতটি দেশ হল পর্যায়ক্রমে : জার্মানি, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন, আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড।

❑

প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় ইভান গুলাগং কেলির আত্মজীবনী 'হোম— দ্য ইভান গুলাগং স্টোরি' অস্ট্রেলিয়ার বইয়ের বাজারে ঝড় তুলেছে। প্রথম সংস্করণের ৬০ হাজার বইয়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় সব শেষের পথে। প্রকাশের ন' দিনের মধ্যেই এটি বিক্রির হিসেবে এক নম্বরে চলে আসে। প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। দু'বার উইম্বলডন এবং চারবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টুর্নামেন্টে বিজয়ী গুলাগং ১৭ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে কিছুদিন আগে স্বদেশে ফিরে আসেন। এক বন্ধু সাংবাদিকের পরামর্শে নিজের সংগ্রাম, ১২ বছর বয়স থেকে কীভাবে নিজেকে তিনি তৈরি করেছেন, এ-সবই বর্ণনা করেছেন নিজের আত্মজীবনীতে। দর্শক ও পাঠকরা যে তাঁকে এতখানি ভালবাসেন, তা অবশ্য অনুমান করতে পারেননি গুলাগং। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৪-এর প্রথম দিকে তাঁর বইটি প্রকাশিত হবে আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে। সেখানেও বইটি ভাল বিক্রি হবে বলে আশা করেছেন ৪২ বছর বয়সী ইভান গুলাগং।

❑

জর্দি নামটা এখন খুব অচেনা মনে হলেও, অদূর ভবিষ্যতেই বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় নাম হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন হল্যান্ডের ফুটবল সমর্থকরা। ১৯ বছরের জর্দি বেশ কিছুদিন বার্সিলোনা ক্লাবের দ্বিতীয় দলে খেলার পর এই মরসুমে যোগ দিলেন প্রথম ডিভিশনের ক্যাটালান ক্লাবে। চার বছরের চুক্তিতে তাঁকে নেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জর্দির পায়ের কাজ এখনই দেখার মতো। কোপেনহেগেনে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে তিনি চমৎকার খেলেন। জর্দির ওপর হল্যান্ডবাসীদের এত আশা-ভরসার প্রধান কারণ, তিনি তাঁদের দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার জোহান ক্রুয়েফের ছেলে। ক্রুয়েফের ছেলেও যে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে হল্যান্ডকে আবার বিশ্বসেরার পর্যায়ে তুলে আনবেন, সে-ব্যাপারে তাঁদের কোনও সন্দেহ নেই।

চণ্ডীগড়ের কাছে মোহালিতে হিরো কাপের ম্যাচ হচ্ছিল ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার। একজন আম্পায়ার, স্টিভ বাকনারকে দেখা যাচ্ছিল, সময় সুযোগ পেলেই খেলার ফাঁকে তিনি ফুটবলারদের মতো বল ছাড়া শ্যাডো প্র্যাকটিস করছেন। কখনও পা দিয়ে বল নাচানোর ভঙ্গি করছেন, কখনও করছেন ড্রিব্‌ল। ক্রিকেটের মাঠে ফুটবলের প্র্যাকটিস কেন? আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকনার আটটি টেস্ট ম্যাচ খেলালেও ফুটবলের দারুণ ভক্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা রেফারি তিনি। ফিফার নির্বাচিত রেফারি হিসেবে বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ে এল সালভাদোর-এর সঙ্গে নেদারল্যান্ড্‌স অ্যান্টিলেসের ম্যাচ খেলিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এখন ক্রিকেটের আম্পায়ার হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও রেফারিং-ই করতে শুরু করেন আগে, ১৯৮৬ সালে। ফুটবল এবং ক্রিকেট—দুটি খেলাতেই আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ পরিচালনা করার কৃতিত্ব বাকনার ছাড়া আর ক'জনের আছে—বোধ হয় হাতে গুনে বলে দেওয়া যায়।

ফোটো : অলক মিত্র

আপনার জীবনের স্বপ্ন ভাসে ওর উজ্জ্বল চোখে। আর ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আপনারই হাতে!

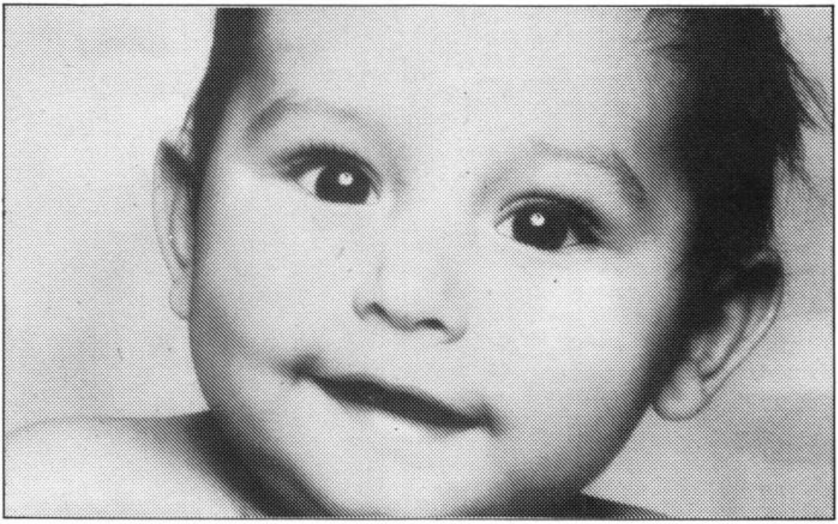

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি।

আপনার বুকভরা ভালবাসার মতই এটি বাড়ছে, আর বাড়ছে, আর বাড়ছে।

আহা, ওর জন্যে আপনার কত স্নেহমমতা! ওর প্রতিটি প্রয়োজন মেটান নিখুঁত যত্নে। দিনরাত প্রতি মুহূর্তে ও কত নিশ্চিন্ত বোধ করে। আর এটাই কি ওর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার সঠিক সময় নয়? আজ সামান্য একটু পরিকল্পনা করে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলুন। আপনি হয়তো ভাবছেন কোন আশ্চর্য চাবিকাঠিতে। ভাল কথা, আমরা তো সেইজন্যেই আছি। আমাদের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধির দৌলতে। যেটির সুযোগে আপনি একথোকে একবারেই বিনিয়োগ করতে পারেন। অথবা প্রতি বছরে কিছু করে টাকা। তারপর দেখুন আপনার গচ্ছিত টাকা কেমন কেবল বাড়ে আর বাড়ে, ওর 21 বছর বয়স অবধি। এবং ও হয় লাখপতি। ভাবুন তো, এই উপহার ওর জীবনে কত উপকারে আসতে পারে। হয় তো এটি ওর উচ্চ শিক্ষার পথ খুলে দেবে। অথবা ওর নিজস্ব একটি ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে। কিংবা, সে নিজস্ব একটি ছোট্ট বাড়িও কিনতে পারবে। ওর 18 বছর বয়স হলে ও বছরে দু'বার টাকা তুলতে পারবে। আর বাকী টাকাটা ওর 21 বছর বয়স অবধি একনাগাড়ে বেড়ে যাবে। শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি। একদিন আপনার সন্তানই আপনার পরিকল্পনার জন্য ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাবে।

14% ডিভিডেণ্ড! বোনাস প্রতি 3 বছরে!

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
আপনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য

কর্পোরেট কার্য্যালয়: ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ (নিউ মেরিন লাইন্স) বোম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন-২০৬৮৪৬৮ **জোনাল কার্য্যালয়:** ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২২০ ৫৩২২ **শাখা কার্য্যালয়:** আশানিবাস, ২৪৬ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪, ফোন-৫৬১৪১ ● ২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২২০ ৯৩৯১ ● ৩য় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩ ২১৬ ফোন-৮১০২ ● জীবনদীপ, এম এল নেহরু রোড, পানবাজার, গৌহাটি ৭৮১ ০০১, ফোন-৫৪৩১৩১, ● ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিল্ডিং, মেইন রোড, বিস্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১ ০০১ ফোন-২৫৫০৮ ● জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১, ফোন-২২ ২৪৭০ ● জীবনদীপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১

সব সিকিওরিটি বিনিয়োগেই বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে। বিনিয়োগের পূর্বে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বা এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

Sista's-UTI-213/93 BEN

আর্চি
ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি আর গ্রিসের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড মন্দা একটিমাত্র অনিবার্য সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয় !
ভেরনিকা লজ ইউরোপ সফর শেষ করেছে !
আমি ফিরে এসেছি !
তা হলে তোমার ইউরোপ সফরের কথা বলো !
বলব... স্থানীয় খবর শুনে !
8-22
আমি দু' সপ্তাহ বাইরে ছিলুম ! সব কথা শোনাও !
সেই মামুলি ব্যাপার...
জাগহেডের নতুন বাচ্চা বোন, বেটির চাকরি, রেগি আর মিজের ঘনিষ্ঠতা মুজের চোখে পড়া...
বাহ্, খাসা !
থেমো না, আমাকে সব খুলে বলো !
সত্যিই এর দরকার নেই, রন...
আজকাল যেমন হয়, সবকিছু নিয়েই টিভি ফিল্ম হচ্ছে !
সেটে সবাই চুপ করুন !
'রিভারডেল ! না-বলা গল্প'... টেক ওয়ান !

সব টুথব্রাশ

ব্রিস্‌ল্‌ই দেখতে

একরকম

কিন্তু আসলে

কি তাই ?

সাধারণ টুথব্রাশের ব্রিস্‌লের এবড়োখেবড়ো ডগা।

সিবাকা টায়নেক্সের ব্রিস্‌ল্‌, যার ডগাগুলো সমানভাবে গোলাল

বেশীর ভাগ টুথব্রাশ দাবী করে যে তাদের ব্রিস্‌ল্‌গুলি সমানভাবে গোলাল এবং দাঁতের মাড়ির পক্ষে নিরাপদ। কিন্তু আসলে তা নয়। সিবাকা রেঞ্জের সিবাকা সুপ্রীম ও সুপার ডিলাক্স টায়নেক্স® নাইলন দিয়ে তৈরী। আমেরিকার ড্যু পণ্ট কম্পানী থেকে আপনাদেরই জন্য টায়নেক্স® ইম্পোর্ট করা হয়েছে। টায়নেক্স® নাইলনের ব্রিস্‌ল্‌ একেবারে সমান ও একদম গোলাল হয়। সাধারণ নাইলনের চেয়ে অনেক ভাল।

IMPORTED
Tynex®
BRISTLES
From DuPont, USA

এই কারণেই সিবাকা টুথব্রাশ মাড়িতে মালিশ করে। অর্থাৎ বেশী নিরাপত্তা ও ব্রাশ করার বেশী শক্তি।

তাই আজই টায়নেক্স® শক্তির ফয়দা নিন... আর হাসুন প্রাণ খুলে!

ULKA- 6501-BEN-B

সিবাকা*
টুথব্রাশ

দ ন্ত - স্বা স্থ্যে আ ন্ত র্জা তি ক স্ত র স্থা প ন

® টায়নেক্স ড্যু পণ্ট, ইউ.এস.এ.র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিকল্প চিকিৎসা

আমেরিকায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়াও ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 'অলটারনেটিভ মেডিসিন' বা 'বিকল্প চিকিৎসা'। লিখেছেন **বিমল বসু**

ভারত, চিন, জাপানের পর এখন আমেরিকাতেও সরকারি অনুমোদন পেতে চলেছে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়াও যেসব চিকিৎসা চালু আছে, সাধারণভাবে সেগুলিকে 'অলটারনেটিভ মেডিসিন্‌স' বা 'বিকল্প চিকিৎসা' বলা হয়। আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে এবং এগুলি এখন অনেক দেশেই স্বীকৃত। এ ছাড়াও আছে 'ট্রাইবাল মেডিসিন' বা 'আদিবাসী চিকিৎসা', যা নিয়েও কোথাও-কোথাও গবেষণা চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারিভাবে স্বীকৃত না হলেও, বেশ কয়েকটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এখন চলছে। গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি সংস্থাও। 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গত বছর ছ'কোটি মার্কিন নাগরিক বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসার সুযোগ নেন, এবং এজন্য খরচ হয় মোট ১৪০০ কোটি ডলার। বিকল্প চিকিৎসা যে আমেরিকায় ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে এটা তারই প্রমাণ। সুতরাং সরকারেরও টনক নড়েছে।

মার্কিন সরকার বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি দফতর খুলেছেন, যা দেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ-এরই অধীন। এখানে বিকল্প চিকিৎসার কার্যকর দিক নিয়ে গবেষণা চলবে, খতিয়ে দেখা হবে এর ভাল-মন্দ। অনেকেরই মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ক্যালিফোর্নিয়ার 'অ্যালায়েন্স অব অলটারনেটিভ হেল্‌থ কেয়ার' সংস্থার প্রধান স্টিভ গোরম্যান বলেছেন, "সরকার বিকল্প চিকিৎসার যৌক্তিকতা যে বুঝতে শুরু করেছেন, এটা একটা ভাল লক্ষণ।" মার্কিন সরকার এ-বাবদে প্রথম বছরের জন্য বরাদ্দ করেছেন ২০ লক্ষ ডলার। এর পেছনে আছে বিকল্প চিকিৎসার সদ্য অনুরাগী এক সেনেটরের আন্তরিক প্রচেষ্টা। টম হার্কিন নামে আইওয়া-র এই সেনেটর এ-ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাঁরই এক ক্যানসার আক্রান্ত সহকর্মী বিকল্প চিকিৎসায় ফল

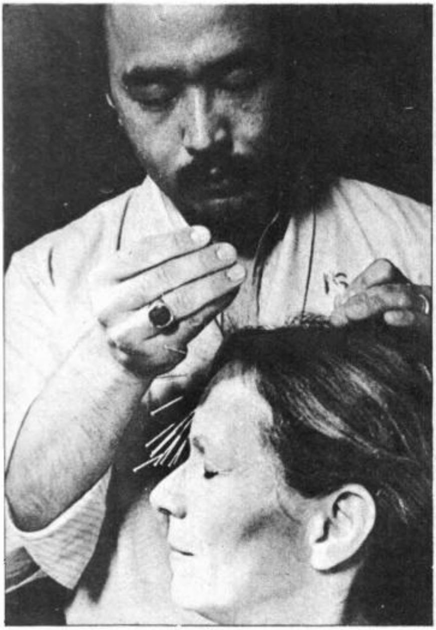

আকুপাংচার করাচ্ছেন এক মার্কিন মহিলা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারিভাবে স্বীকৃত না হলেও, বেশ কয়েকটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এখন চলছে। গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি সংস্থাও। 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গত বছর ছ' কোটি মার্কিন নাগরিক বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসার সুযোগ নেন এবং এ জন্য খরচ হয় মোট ১৪০০ কোটি ডলার।

পাওয়ার পর। হার্কিন জানিয়েছেন, "বিকল্প চিকিৎসা দফতর এমন সব পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা এবং প্রয়োগের পরীক্ষা চালাবে, যেগুলি এর আগে অচল বলে বর্জন করা হয়েছিল। অপ্রচলিত বলেই এ-ধরনের চিকিৎসার সুফল থেকে মার্কিন জনসাধারণ যাতে বঞ্চিত না হন, সেটা দেখাই আমাদের কর্তব্য।" নতুন বিকল্প চিকিৎসা বিভাগের অধিকর্তা ডঃ জোসেফ জ্যাকব বলেছেন, "বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করার সঙ্গে-সঙ্গে এর যথাযথ প্রয়োগের দিকটাও আমরা খতিয়ে দেখব। মানুষ এখন প্রচলিত চিকিৎসার সীমাবদ্ধতাও বুঝতে পারছে। তবে নতুন দফতর অবশ্যই 'কোয়াক' অর্থাৎ 'হাতুড়ে' পদ্ধতিগুলিকে আমল দেবে না। আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার ইত্যাদি জনপ্রিয় এবং স্বীকৃত ব্যবস্থাই হবে আমাদের গবেষণার বিষয়।" গোরম্যান মনে করেন, আমেরিকায় এই নতুন পদক্ষেপের ফলে এমন কিছু অসুখের নিদান মিলবে, প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় যা পাওয়া যায় না।

"শতায়ু হও!"

যখন ব্যাথাবেদনা কাবু করে, আপনি সরাসরি শরণ নেন আপনার বিশ্বস্ত অম্রুতাঞ্জন পেইন বামের। ❋ দেখতে দেখতে এর প্রমাণিত ফর্মূলা যেই কাজ দেখাতে শুরু করে, আপনি দেখেন মিনিটকয়েকেই ব্যাথাবেদনা কোথায় চলে গেছে! ❋ **"চলে গেছে!"** হাসিমুখে বলে ওঠেন আপনি। আব আপনার চিরবিশ্বস্ত বন্ধুকে জানান অজস্র নীরব আশীর্বাদ। ❋ যা বহুবছর ধরে লক্ষ লক্ষ লোক ক'রে এসেছেন। ❋ বোধহয় এতজনের সম্মিলিত আশীর্বাদের জোরেই অম্রুতাঞ্জন এতদূর পথ পাড়ি দিতে পেরেছে। পুরো একশোটি বছর পার করেছে। গোটা একটি শতাব্দী। ❋ আপনাদের ঠিক এইরকম শুভেচ্ছা ও সমর্থনের জোরে, আগামী আরো একটি শতাব্দী আরো সার্থক হয়ে উঠুক।

একশো বছরের 100 উরসাভরা

অন্তরের স্পর্শভরা, যত্ন-করা, আরামঝরা একশোটি বছর।

অম্রুতাঞ্জন লি: মাদ্রাজ • ব্যাঙ্গালোর • বম্বে • কলকাতা • গাজিয়াবাদ • হায়দ্রাবাদ • নিউ দিল্লী

কনিষ্ক

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

"ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ ডঃ প্রভাকর।" মহাকাশচারীর পোশাক পরা প্রথম আততায়ী বাঁ হাতের দু' আঙুলে মাইক্রো টেপ ক্যাসেটটা ধরে থেকে ডান হাতের লেসার গানটা নাচাল। "সেন্টাউরি মিনারেল এন্টারপ্রাইজ এই ক্যাসেটের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। বলা যায় না, তারা হয়তো বিটা গ্রহ নম্বর আট থেকে মার্বেল পাথর এনে, এইখানে, দ্য গ্রেট ক্রেটারের পাশে আপনার একটা মর্মরমূর্তিও বসাতে পারে!" হো-হো করে হেসে উঠল প্রথম আততায়ী।

আলফা সেন্টাউরির খনিজসমৃদ্ধ দ্বিতীয় গ্রহে এখন রাত। গ্রহের দ্বিতীয় সূর্য বিটা সেন্টাউরিকে এখানে চাঁদের মতো দেখায়। তবে, চাঁদের চেয়েও তীব্র জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে সারা গ্রহ। প্রাণহীন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ এই পাথুরে গ্রহের বুকে নেমে এসেছে এক অপার্থিব রহস্যময়তা। গা শিরশির করে। এই রহস্যময়তা আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দ্য গ্রেট ক্রেটার। আলফা সেন্টাউরি বা বিটা সেন্টাউরি— কারও আলোই বছরের এই সময়ে দ্য গ্রেট ক্রেটারের তিন কি.মি. গভীর তলদেশকে স্পর্শ করতে পারে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ভরা এক বিশাল অন্ধকার সমুদ্রের মতোই পড়ে থাকে দ্য গ্রেট ক্রেটার।

"ডক্টর, আপনার মতো ভূতত্ত্ববিদ, খনিজ বিশেষজ্ঞকে পেয়ে সেন্টাউরি মিনারেল কর্পোরেশন নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। আলফা আর বিটার চার-চারটে গ্রহের খনিজসম্পদ আপনি কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিয়েছেন। এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি ডুবে যাচ্ছিল। তাই বিটা আট গ্রহের সমস্ত তথ্যভরা মাইক্রো ক্যাসেট আমাদের চুরি করে নিতে হয়। আপনি এবং কর্পোরেশন সাবধান হয়ে গেলেন। ফলে, এবার আর চুরি করা গেল না। কেড়ে নিতে হল। এর জন্যে আমি দুঃখিত, ডঃ প্রভাকর। ক্ষমা করবেন।"

দাঁতে দাঁত চেপে ডঃ প্রভাকর বললেন, "ঠিক আছে। এবার আমায় যেতে দাও। রাত হল।"

"কোথায় যাবেন? বেস ক্যাম্প এক-এ? না, ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে? উঁহু। তা হয় না ডক্টর। আপনার আরও একটা কাজ বাকি। সারা গ্রহ জরিপ করেছেন। তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করেছেন কোথায় কী খনিজ আছে, কতটা। এই মাইক্রো টেপে ভর্তি করেছেন সমস্ত ডেটা। কিন্তু একটা কাজ এখনও বাকি। এই দ্য গ্রেট ক্রেটারের ভেতর আপনি কোনও অনুসন্ধান চালাননি। আমার বিশ্বাস, এখানে রয়েছে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় হিরের খনি। যান। খোঁজ করুন। যান।" কঠোর হয়ে উঠল প্রথম আততায়ীর গলা।

হতবাক হয়ে যাওয়া ডঃ প্রভাকর বললেন, "তুমি কি পাগল?"

প্রথম আততায়ী বলল, "পাগল নই, শয়তান।"

"না। না।" সভয়ে বললেন ডঃ প্রভাকর।

দ্বিতীয় আততায়ী এতক্ষণ নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম আততায়ী তার দিকে ইশারা করতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডঃ প্রভাকরের ওপর। তাঁর মহাকাশচারীর পোশাকের গায়ে লাগানো অক্সিজেন

সিলিন্ডারের পাইপটা চেপে ধরে দ্বিতীয় আততায়ী ডঃ প্রভাকরকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল। ডঃ প্রভাকর ছিটকে পড়লেন অন্ধকারময় দ্য গ্রেট ক্রেটারের বুকে। পাইপটা ছিঁড়ে রয়ে গেল দ্বিতীয় আততায়ীর হাতে।

ডঃ প্রভাকরের বুকফাটা মরণ আর্তনাদ বেতারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু লো রেঞ্জ ট্রান্সমিটার। সেই শব্দ দু'জন আততায়ী ছাড়া আর কেউই শুনতে পেল না। ওয়ার্ক সাইট আর বেস ক্যাম্প-এক বেশ খানিকটা দূরে। কাজ শেষ। আগামীকাল গ্রহ ছেড়ে যাওয়ার জন্য সবাই জিনিসপত্র গোছানোয় ব্যস্ত। সুতরাং, কে শুনবে?

পৃথিবী থেকে নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন চারদিনের পথ। ট্রাইটন থেকে আলফা সেন্টাউরির স্পেস স্টেশন প্রায় সাড়ে চার আলোকবর্ষের পথ। স্পেস টানেলের মধ্যে দিয়ে সুপার এক্সপ্রেসে চব্বিশ ঘণ্টা। স্পেস স্টেশন থেকে আলফা সেন্টাউরির গ্রহ নম্বর দুই— মহাকাশ ভেলায় একঘণ্টা।

মহাকাশ ভেলা ফিরে গেছে। প্রাণহীন রুক্ষ পাথুরে-ক্রেটারে ভরা লালচে গ্রহনম্বর দুই। অভ্যর্থনাকারীদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেন্টাউরি মিনারেল কর্পোরেশনের ইনভেস্টিগেটর কনিষ্ক।

মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে আলফা সেন্টাউরি। তীব্র জ্বালায় রসহীন এই গ্রহ যেন আরও রসহীন হয়ে যাচ্ছে। ধুলো ওড়া দেখে কনিষ্ক অনুমান করতে পারছিল যে ঝড় বইছে। বাতাস মানে তো এখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই ধুলিঝড়ের মধ্য দিয়ে ইস্পাতের ফিতেওলা চাকায় ভর করে টলমল ভাবে এগিয়ে আসা ল্যান্ডরোভারটাকে এক সময় দেখতে পেল কনিষ্ক। সে জানে, ওই রোভারের মধ্যে চারজনের থাকার কথা। গুরবক্স আর সুনীল, হারিয়ে যাওয়া এবং নিশ্চিতভাবে মৃত ডঃ প্রভাকরের দুই সহযোগী, আর রানাডে ও ভানুবন্ত হাইপার স্পেস রেডিয়ো এঞ্জিনিয়ার এবং অপারেটর্‌স। এরাই বেতারের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলেছে। ডঃ প্রভাকরের অনুপস্থিতিতে এই চারজনই সপ্তরজনের সার্ভে টিমের হর্তাকর্তা।

ধুলোর মেঘ দেখে কনিষ্কের মনে পড়ে গেল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিষ্ণুকান্তের চুরুটের ধোঁয়ার কথা।

"এটা তোমার প্রথম এবং শেষ চান্স, বুঝলে মিঃ ইনভেস্টিগেটর, কনিষ্ক। এই দশদিন পরেও ডঃ প্রভাকর বেঁচে থাকবেন এমনটা আশা করা ঘোরতর অন্যায়। গ্রেট লস টু দ্য কর্পোরেশন। কিন্তু সেই মাইক্রো টেপ ক্যাসেটটা, যার মধ্যে রয়ে গেছে সমস্ত সার্ভে রিপোর্ট। ওই ক্যাসেটটার দাম এখন কয়েক কোটি বিলিয়ন ডলার। তোমার পৌঁছবার পরে হাতে মাত্র দিনসাতেক সময় থাকবে। ওই সময়ের মধ্যে ক্যাসেটটা উদ্ধার করে যদি পৃথিবীতে ট্রান্সমিট না করতে পারো, তা হলে সব গেল! নির্দিষ্ট দিনে যদি সার্ভে রিপোর্টের সঙ্গে আমাদের আবেদনপত্র ফেডেরাল মিনারেল ডিপার্টমেন্টে জমা না দিতে পারি, তা হলে, আমরা ওখানে খনিজ তোলার ইজারা পাব না। নতুন করে সার্ভে করার অধিকার পেয়ে যাবে সেন্টাউরি মিনারেল এন্টারপ্রাইজ। আমাদের কোম্পানি— বিটা আট নম্বর গ্রহের লোকসানের পর এই লোকসান আর সামলাতে পারবে না। পথের ভিখিরি হয়ে যাবে, কনিষ্ক!" শেষের দিকে বড় করুণ শোনাচ্ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিষ্ণুকান্তের গলাটা।

"কেন অযথা চিন্তা করছেন, বস। বিটা আটের সময় আমি ছিলাম না। এখন আমি আছি। কেসটা খুবই সোজা এবং সরল। আপনি জাস্ট রিলাক্স!" সান্ত্বনা দিয়েছিল কনিষ্ক।

"সান্ত্বনা দিচ্ছ? বেশ, মনে থাকে যেন, যদি কোম্পানি পথে বসে তা হলে তোমাকেও ডিসম্যানটল করে ফেলব।"

"তার কোনও দরকার হবে না, বস। আমিও উঠছি। ওই গ্রহ সংক্রান্ত, আপনার সার্ভে টিম সংক্রান্ত ডেটাগুলো একটু ঝালিয়ে নিই।"

ল্যান্ডরোভার থেকে মহাকাশচারীর পোশাকে চারজন অভ্যর্থনাকারী নেমে এল। "হাই, মিঃ ইনভেস্টিগেটর!"

"কনিষ্ক। ধন্যবাদ মিঃ গুরবক্স, সুনীল, রানাডে আর ভানুবন্ত।"

চারজনের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। "আপনি আমাদের...।"

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনজোড়া পাখি

এই দ্যাখো, কল্পনায় কল্পনায় নয়, কেবল আভাসের টানে-টানে ফুটে উঠল সম্পূর্ণ ছবি। হ্যাঁ, এই তিনজোড়া পাখি এখন আঁকার পাতা জুড়ে কিচিরমিচির করুক। আর তোমরা যেমন খুশি, মনের রঙে রং করো ছবিগুলি। রং করো আর আঁকার পাতায় আঁকো আরও একঝাঁক রঙিন পাখি।

হাসিখুশি

পরিমলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন প্রসন্নবাবু, "আচ্ছা পরিমলবাবু, কী ব্যাপার বলুন তো, কাউকে বলছেন চাঁদিপুর গিয়েছিলেন, কাউকে বলছেন দার্জিলিং, আবার কাউকে বলছেন বেনারস।"

"আরে মশাই, সকলের মন তো আর এক নয়, যে যেরকম বিশ্বাস করবে, তাকে সেইরকমই বলছি।"

❑

"ছোটবোনটাকে অত কাঁদাচ্ছিস কেন রেখা?"

"বা রে, ও তো নিজেই কাঁদছে। পুকুরের ধারে ও একটা গর্ত খুঁড়েছে, সেটা এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়।"

বিরু জিজ্ঞেস করল রুবিকে, "অ্যাই রুবি, স্বার্থপরের ইংরেজি কী রে?"

"জানলেও বলতে পারব না রে। প্রণতিদি চোখ পাকিয়ে আছেন। দেখছিস না?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলতে হবে না তোকে। আমি জানতাম না তুই এমন সেলফিশ।"

ছবি: দেবাশিস দেব

শুকনো গলায় কনিষ্ক বলল, "অবাক হওয়ার মতো কোনও ব্যাপার নয়। আমি একবার যা দেখি, একবার যা শুনি তা আর ভুলি না। পৃথিবীতে বসে আমি আপনাদের ডোসিয়ার দেখেছি। এই গ্রহের পুরো মানচিত্রও আমার মুখস্থ। নিন। চলুন।"

রানাডে এগোতে গিয়েও থেমে গেল, "আপনার মালপত্র ?"

"মালপত্রে কী হবে ? আমি এখানে বেড়াতে আসিনি। কাজে এসেছি।" ইচ্ছে করেই রূঢ় হল কনিষ্ক।

কেউ আর কোনও প্রশ্ন করল না। চালকের আসনে বসল সুনীল। তার পাশে কনিষ্ক। পেছনে বাকি সবাই। বোল্ডার ছড়ানো পথ বেয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল ল্যান্ডরোভারটা। লক্ষ্য বেস ক্যাম্প নম্বর এক।

সময় নষ্ট করা কনিষ্কের ধাতে নেই। সরাসরি সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আগামী সাতদিনের মধ্যে সার্ভে রিপোর্টের সঙ্গে আবেদনপত্রটা জমা দিতে হবে। নইলে কর্পোরেশনের কোটি-কোটি বিলিয়ন ডলার জলে চলে যাবে। বিটা আটের পর এই লোকসানের চোট সামলাবার ক্ষমতা কোম্পানির নেই।"

গুরবক্স মাথা নিচু করে বলল, "জানি বইকী !"

"তা হলে ডঃ প্রভাকরের নিরুদ্দেশ, সরি, মৃত্যুর খবরটা জানাতে দশ-দশটা দিন কেন লেগে গেল ? মৃত্যুই বললাম, কারণ, স্পেস স্যুটের অক্সিজেনে একটা মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে ? বড়জোর বারো ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা, ছত্রিশ ঘণ্টা। দশ দিন নিশ্চয় নয়। এখন তো পনেরো দিন হয়ে গেল।"

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে কনিষ্ক আবার বলে উঠল, "তাও খবরটা গেছে স্পেস স্টেশনের মাধ্যমে। আমাদের নিজস্ব চ্যানেলের কী হল ?"

রানাডে বলল, "দেখুন মিঃ কনিষ্ক, দেরি হওয়ার দুটো কারণ ছিল। এক, আমরা ডঃ প্রভাকরকে খুঁজছিলাম, জীবন্ত অথবা মৃত। কারণ মাইক্রো ক্যাসেটটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আর সেটা ছিল ডক্টরের পকেটে, অন্তত আমরা যা দেখেছি। দ্বিতীয়ত, আমাদের হাইপার স্পেস ট্রান্সমিটারটা ঘটনার দিন থেকেই খারাপ হয়ে আছে। ক্যাসেটটা খুঁজে বের না করে তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়েই বা কী হত ?"

কনিষ্ক বলল, "কেন, আমি ছুটে আসতাম, ক্যাসেটটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে— ওটা গ্রহের বাইরে যায়নি নিশ্চয়।"

গুরবক্স বলল, "তা হলেও সেটা এখন খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো ব্যাপার নয় কি ?"

কনিষ্ক বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে বলল, "আর তাই খুঁজতেই তো আমি এসেছি। বিটা আটে ক্যাসেটটা কোথায় থাকত ?"

"টেবিলের ওপর," সুনীল বলল।

রানাডে বলল, "আর সেইজন্যে চোর ক্যাসেটটা বদলে নিতে পেরেছিল। পৃথিবীতে যা ট্রান্সমিট করা হয়েছিল— তা একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট। ব্যাপারটা যখন ধরা পড়েছিল, তখন আর সময় ছিল না। অবশ্য উদ্ধার করা সম্ভব হত বলেও মনে হয় না।"

কনিষ্ক বলল, "একই সার্ভে টিম ওখানেও কাজ করেছিল, তাই না ? আর তাই যদি হয় তা হলে সেই চোর এখানে রয়েছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিষ্ণুকান্ত কাজটা ঠিক করেননি।"

রানাডের গলায় শ্লেষ ফুটে উঠল। "ডঃ প্রভাকর বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, তিনিই ভুলবশত ক্যাসেটটা মুছে ফেলেছিলেন। আলফা দুইয়ে তিনি লোকসান পুষিয়ে দেবেন। তা হয়তো দিতেও পারতেন। এই গ্রহটা সত্যি এক রত্ন খনি। অদ্ভুত কাজ করেছিলেন ডক্টর। কর্পোরেশনের কোটি-কোটি বিলিয়ন ডলার লাভ হত।"

ভানুবন্ত বলল, "কিন্তু এবার ক্যাসেট সমেত ডঃ প্রভাকরকেই হাওয়া করে দেওয়া হয়েছে, খোঁজ করুন সেন্টাউরি মিনারেল এন্টারপ্রাইজের অফিসে। দেখবেন, ক্যাসেট সমেত ডক্টর প্রভাকর ট্রান্সমিট হয়ে গেছেন।"

গুরবক্স রেগে উঠল। "কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন ভানুবন্ত ?"

"কিছু না। কিছু না। তবে এখানে যে এন্টারপ্রাইজের চর রয়েছে সে-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য মিঃ কনিষ্ক যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারেন। গ্রহ ছেড়ে সেও নিশ্চয় যায়নি।"

গুরবক্স কিছু একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুনীল তাকে থামিয়ে দিল। কনিষ্ক আড়চোখে সেটা লক্ষ করল।

"মিঃ গুরবক্স। সেদিন ঠিক কী-কী ঘটেছিল, আমায় বলুন।"

রাগত গলায় গুরবক্স বলল, "ঘটবে আর কী ? খুবই সাধারণ ব্যাপার। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর প্রভাকর ঠিক করলেন যে, হাতে সময় থাকতেই তিনি এবার সার্ভে রিপোর্ট ট্রান্সমিট করে দেবেন। সেদিন বিকেলে যথারীতি আমরা ওয়ার্ক সাইটে গেছি। হাইপার স্পেস ট্রান্সমিটারটা ওখানেই রয়েছে। রানাডে আর ভানুবন্ত দেখাশোনা করে। আমি ট্রান্সমিট করাটা জানি। আমার শখ হল, আমিই ট্রান্সমিট করব। কিন্তু ট্রান্সমিট করতে গিয়ে দেখি, যন্ত্রটা কাজ করছে না। রানাডে আর ভানুবন্তকে বলা হল। তারা যন্ত্রটা সারাতে বসল। হাঁ করে বসে রইলেন ডঃ প্রভাকর। সন্ধে হয়ে আসছিল। আমার বিরক্তি লাগছিল। জিনিসপত্র গোছাবার কাজও বাকি। তাই ডক্টরকে বললাম, আমি আর সুনীল ফিরে যাচ্ছি। আপনিও আসুন। ওরা যন্ত্রটা সারাক। কালই না হয় ট্রান্সমিট করা যাবে।"

"ডঃ প্রভাকর বললেন যে, তিনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। রোভারটা নিয়ে আমরা দু'জন ফিরে যেতে পারি। তিনি হেঁটে ফিরবেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, অসুবিধে কিছু নেই। হেঁটে তিনি প্রায়ই ফিরতেন। এটা তাঁর শখ।"

রানাডে বলল, "বাকিটুক আমি বলছি। ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেষ্টা করেও আমি আর ভানুবন্ত মেশিনটাকে সারাতে পারলাম না। তবে কারণটা ধরতে পারলাম। একটা চিপ খারাপ হয়ে গেছে। পুরো কার্ডটাই পালটাতে হবে। অথচ সব স্পেয়ার গোছগাছ করে বেস ক্যাম্প-একের গুদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভল্টের বিশেষ লকের কোড কেবলমাত্র ডক্টরেরই জানা। তিনিও হাল ছেড়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত বললেন, কাল সকালে তিনি কার্ডটা নিয়ে আসবেন। অগত্যা তিনিও উঠলেন। আমাদের রোভারটা দিতে চাইলাম। তিনি নিতে চাইলেন না। হেঁটে যাওয়াই ঠিক করলেন।"

রানাডে থামতেই গুরবক্স বলল, "এর পর রাত বারোটা বেজে যেতে আমরা রানাডেকে ফোন করে জানলাম যে, তিনি অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছেন। রানাডে তখনই খোঁজ করতে বের হচ্ছিল। আমিই বারণ করলাম। কারণ, বিপদের আশঙ্কা তো কিছুমাত্র ছিল না। সোজা সরল পথ। ঝকঝকে জ্যোৎস্না। আর তিনি নতুনও নন। অনেক সময় তিনি রাত প্রায় শেষ করেও ফিরেছেন। তিনি নাকি গ্রহের অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভালবাসতেন।"

দূরে বেসক্যাম্প এক-কে দেখা যাচ্ছিল। সার-সার কাচের ঘর। গুরবক্স কিছু বলার আগেই সুনীলের অন্যমনস্কতার দরুন

রোভারটা একটা বড় বোল্ডারের গায়ে ধাক্কা মারল। কনিষ্ক বাদে সবাই সিট থেকে ছিটকে পড়ল। সুনীল খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সদাসতর্ক কনিষ্ক অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সুনীলের পোশাকের স্ট্র্যাপটা ধরে ফেলে তাকে শূন্য থেকে আবার ভেতরে নিয়ে এল।

গুরবক্স, রানাডে, ভানুবন্ত, এমনকী সুনীল পর্যন্ত কনিষ্কের এই অসম্ভব কাজ আর শক্তি দেখে হাঁ হয়ে গেল।

কনিষ্ক ব্যাপারটায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বলল, "একটু দেখে চালান, মিঃ সুনীল। হ্যাঁ, মিঃ গুরবক্স...।"

গুরবক্স নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, সকাল থেকে আমরা ডঃ প্রভাকরের খোঁজ শুরু করলাম। চল্লিশ কি.মি. ব্যাসার্ধের প্রতিটি সে.মি. জায়গা আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু, সত্যিই! ভোজবাজির মতোই ডঃ প্রভাকর বাতাসে মিলিয়ে গেছেন। তাঁকে বা তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।"

কনিষ্ক হঠাৎ বলল, "আপনারা একটা জায়গা নিশ্চয় দেখেননি, দ্য গ্রেট ক্রেটার।"

তিনজনেই চমকে উঠল, "না, দেখা হয়নি।"

"কেন?" কনিষ্ক প্রশ্ন করল।

গুরবক্স বলল, "দেখার কোনও অর্থ হয় না, তাই। প্রথমত, পথ ছেড়ে দ্য গ্রেট ক্রেটারের দিকে তার যাওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, বছরের এই সময়টাতে না আলফা সেন্টাউরি, না বিটা সেন্টাউরির আলো ওই ক্রেটারের বুকে পড়ে। গভীর গহন অন্ধকার। তৃতীয়ত, ওই পাঁচ কি.মি. ব্যাসার্ধের ক্রেটারের বুকে অনুসন্ধান চালাবার মতো যন্ত্রপাতি আমাদের নেই।"

কনিষ্ক খুঁতখুঁত করল, "তবু আপনাদের উচিত ছিল। একটা অমূল্য জীবন। কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের একটা মাইক্রো টেপ!"

বেসক্যাম্প এক এসে গিয়েছিল। গুরবক্স আর সুনীল রোভার থেকে নেমে বলল, "মিঃ কনিষ্ক, নামুন। একটু বিশ্রাম নিন। খিদেও নিশ্চয় পেয়েছে। ক্যাম্পটাও দেখে যান।"

কনিষ্ক একটু রূঢ়ভাবেই বলল, "বলেছি তো আমি এখানে প্রমোদভ্রমণ করতে আসিনি। কোটি-কোটি বিলিয়ন ডলারের ক্যাসেটটা আমায় উদ্ধার করতে পাঠানো হয়েছে। আর কাজের সময় আমার বিশ্রাম এবং খাওয়াদাওয়া না হলেও চলে। মিঃ গুরবক্স। আপনারা ক্লান্ত। বিশ্রাম নিন। সময়ে দেখা করব। আমি ওয়ার্ক সাইট থেকে আমার কাজ শুরু করতে চাই। চলুন, মিঃ রানাডে। মিঃ ভানুবন্ত, স্টিয়ারিং-এ বসুন।" আদেশ করল কনিষ্ক।

চারজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ভানুবন্ত রোভার স্টার্ট করে দিল।

ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে ফিল্ড স্টাফদের একে-একে জেরা করে তেমন কোনও নতুন তথ্য উদ্ধার করতে পারল না কনিষ্ক। তারা কেউই তেমন কিছু নজর করেনি। পৃথিবীতে ফেরবার আশায় তারা ব্যস্ত ছিল।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছিল। কনিষ্ক হঠাৎ রানাডেকে বলল, "ঠিক আছে। আমার যা জানার তা জেনেছি। এখন আমি একবার হাইপার স্পেস ট্রান্সমিটারটা দেখব।"

গম্ভীর হয়ে গেল রানাডে। "আপনি ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর। হাইপার স্পেস ট্রান্সমিটার সম্পর্কে কি কিছু জানেন? এটাও কি আপনার এক্তিয়ারে পড়ে?" স্পষ্টই বিরক্ত হল রানাডে।

কনিষ্ক হেসে ফেলল। বলল, "রাগ করছেন কেন? আমরা হচ্ছি জ্যাক অব অল ট্রেড্স। আসলে, আমাদের একটা ধর্ম আছে। কোনও জিনিস স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করি না। আমি সেই ধর্মের তাগিদেই মেশিনটাকে দেখে সন্তুষ্ট হতে চাই। প্লিজ!"

ট্রান্সমিটার-রুমে ঢুকে কনিষ্ক বিদ্যুতের সুইচ টিপে ঘরের কাচের দেওয়ালগুলোকে অস্বচ্ছ করে দিল। বাইরে থেকে ভেতরের আর কোনও কিছু দেখা যাবে না। নিশ্চিত হয়ে কনিষ্ক টুল বক্স থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার তুলে নিল।

মিনিট কুড়ির ভেতর কনিষ্ককে বেরিয়ে আসতে দেখে রানাডে বলল, "কিছু বুঝলেন? কুড়ি মিনিটেই সব বুঝে নিলেন?"

কনিষ্ক বলল, "আপনার রাগ যায়নি দেখছি। দেখলাম। কিন্তু কুড়ি মিনিটে কতটা বোঝা সম্ভব সে তো আপনি জানেন। জাস্ট এ রুটিন চেক। মেশিনটা সত্যিই খারাপ।"

রানাডে এবার সহজ হয়ে উঠল। "ধন্যবাদ।"

"আমি এবার বেস ক্যাম্প এক-এ ফিরব। কিন্তু ফেরার পথে দ্য গ্রেট ক্রেটারটা একবার দেখে যাব।"

বিস্মিত হয়ে রানাডে বলল, "আপনি কি মানুষ? এই সাড়ে চার আলোকবর্ষের পথ পাড়ি দিয়ে এসে একফোঁটা বিশ্রাম,

একদানাও মুখে না দিয়ে এখন যাবেন দ্য গ্রেট ক্রেটারে? আশ্চর্য!"

কনিষ্ক বলল, "বলেইছি তো। কাজের সময় খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম, কোনওটারই আমার দরকার হয় না। ক্রেটারটাও স্বচক্ষে একবার দেখে ধর্মরক্ষা করতে হবে। সিরিয়াস হওয়ার মতো কোনও ব্যাপার নয়।"

"ক্যাসেটটা খুঁজবেন না?" ব্যঙ্গ করল রানাডে।

"খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা!" ভানুবন্ত বলল।

"খুঁজছি তো। আমার বিশ্বাস, যেখানে ডঃ প্রভাকরের মৃতদেহটা পাব— ক্যাসেটটা সেখানেই পাওয়া যাবে।"

"আমাদের সকলেরই তো সেই একই বিশ্বাস।"

"আমার আরও একটা বিশ্বাস যে, মৃতদেহটা ওই ক্রেটারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আর কোথাও যাওয়া তো সম্ভব নয়।"

ভানুবন্ত বলল, "সেটাও খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা। কে খুঁজবে?"

"আমি। এবং এখনই।" কনিষ্ক হাসল।

"পাগল নাকি? চাকরি করছেন বলে নিজের জীবনের মায়াও কি থাকতে নেই?"

"আমার জীবনের শর্তই তাই।" রহস্যময়ভাবে কনিষ্ক বলল।

রানাডে আর ভানুবন্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

ল্যাণ্ডরোভারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কনিষ্ক বলল, "আপনারা বিশ্রাম করুন। আর হ্যাঁ। গুরবক্সকে ফোন করে বলে দেবেন, আমি দ্য গ্রেট ক্রেটার হয়ে ফিরব। তারা যেন আমার জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়াদাওয়া সেরে নেয়। বাই।"

চারদিকে থইথই জ্যোৎস্না। কিন্তু দ্য গ্রেট ক্রেটারের বুকে চাপ-চাপ অন্ধকার। কনিষ্ক একটু বিভ্রান্ত হল। এই বিশাল ক্রেটারের বুকে কোথায় ঠিক সে খোঁজ করবে ডঃ প্রভাকরের মৃতদেহ ?

অন্ধকারে তার অসুবিধে নেই। তার ইনফ্রারেড সেন্সর লাগানো চোখে অন্ধকার কোনও বাধাই নয়। তবে এই বিশাল ক্রেটারের প্রতিটি সেন্টিমিটার জায়গা তো আর তল্লাশ করা সম্ভব নয় একার পক্ষে ! হঠাৎ চমকে উঠল কনিষ্ক। তার দেহের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সেন্সর যেন ক্ষীণ একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ ধরতে পারছে। কী হতে পারে সেটা ? নিশ্চয় ডঃ প্রভাকরের পোশাকের সঙ্গে লাগানো ট্রান্সমিটার ব্যাটারির বিকিরণ।

সেন্সরের নির্দেশ অনুযায়ী কনিষ্ক সাবধানে পা ফেলে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে পৌঁছল। একটা বোল্ডারের গায়ে আটকে গেছে দেহটা। বেশি নীচে যেতে পারেনি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কনিষ্ক। স্পষ্টই সে বুঝতে পারল যে অক্সিজেনের নলটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, ক্যাসেটটা যে পকেটে নেই তা জেনেও কনিষ্ক মৃতদেহের পকেট হাতড়াল। না, নেই। মুখে তার এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। মৃতদেহের ব্যবস্থা পরে করা যাবে ভেবে কনিষ্ক সঙ্গে-সঙ্গে ওপরে ওঠা শুরু করল। তার সব কাজ শেষ। শুধু বাকি হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে স্পেস স্টেশন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া আর ক্যাসেটটা উদ্ধার করে পৃথিবীতে ট্রান্সমিট করা।

কনিষ্ক তার পকেট ট্রান্সমিটার বের করে স্পেস স্টেশনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ করে আবার এগিয়ে চলল। সে নিশ্চিত যে, আততায়ী একজন নয় দু'জন। এবং তারা তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যই ক্রেটারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেই।

ক্রেটারের বাইরে পা রাখতেই কনিষ্ক দেখল যে, তার অনুমান সত্যি। লেসার গান হাতে মহাকাশচারীর পোশাকে তার অভ্যর্থনাকারী দু'জন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

"হ্যালো, মিঃ ইনভেস্টিগেটর ! কিছু পেলেন ?" প্রথম আততায়ী গলার স্বর বিকৃত করে প্রশ্ন করল। পরিচয় গোপন করার চেষ্টা।

"নিশ্চয় মিঃ রানাডে অ্যান্ড ভানুবন্ত।" ব্যঙ্গ করল কনিষ্ক।

রানাডে বিস্মিত হল। "আপনি তা হলে চিনে ফেলেছেন আমাদের !".

"হ্যাঁ। ট্রান্সমিটারটা চেক করার সঙ্গে-সঙ্গেই। কিছুই হয়নি ওটার। সামান্য একটা ফিউজ উড়ে গেছে। আমি ঠিক করে দিয়ে এসেছি। সত্যি বলতে কী, কিছুটা পড়াশোনা আমার ছিল।"

ব্যঙ্গের স্বরে রানাডে বলল, "এর পরেও কি আশা করছেন যে, আপনি বেঁচে থাকবেন ? আমি খুব দুঃখিত, মিঃ কনিষ্ক। আপনাকে আমায় খুন করতেই হচ্ছে।"

কনিষ্ক বলল, "চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তার আগে ক্যাসেটটা ফেরত দিন। স্পেস স্টেশন পুলিশের হাতে পড়লে আবার জল ঘোলা হবে। দেরি হয়ে যাবে ফেরত পেতে। আমি যে মিঃ বিষ্ণুকান্তকে কথা দিয়ে এসেছি।"

গর্জন করে উঠল রানাডে। "থামুন। ভানুবন্ত। কুইক।"

"দাঁড়ান।" কনিষ্ক বলে উঠল। "ভানুবন্ত আমার অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপটা ছিঁড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ক্রেটারের মধ্যে ফেলে দেবেন তো ? তা দিন। অক্সিজেনে আমার কোনও প্রয়োজন হয় না। আমি আবার ক্রেটার থেকে বেরিয়ে আসব।"

রানাডে ভানুবন্তকে সতর্ক করে দিল, "কুইক, শয়তানটা সময় গেইন করতে চাইছে। ওসব চালাকি আমার জানা আছে।"

"না-না। দাঁড়ান। দাঁড়ান। আচ্ছা বেশ। এই দেখুন।" কনিষ্ক তার হেলমেটটা খুলে ফেলল হঠাৎ। "বিশ্বাস হচ্ছে ?"

বিস্ফারিত চোখে রানাডে আর ভানুবন্ত তাকিয়ে রইল হেলমেট খোলা কনিষ্কের দিকে। "অসম্ভব। এ ধোঁকা, চালাকি।"

কনিষ্ক দু'জনের দিকে এগোতেই রানাডে আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল, "থামুন। নইলে গুলি করতে বাধ্য হব।"

কনিষ্ক বলল, "চেষ্টা করুন। মনে হয় এতেও আমার কিছু হবে না।"

ঝাঁকে ঝাঁকে লেসার রশ্মি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল কনিষ্কের ওপরে। কিন্তু, কনিষ্ক তবু এগিয়ে চলল। "ক্যাসেটটা দিন। আপনার পকেটে রয়েছে। আমি জানি।" নিরুত্তাপ গলায় কনিষ্ক বলল।

লেসার গান ব্যর্থ হতে দেখে রানাডে আর ভানুবন্ত তাদের সাহসের শেষ বিন্দুটুকু হারিয়ে ফেলে ছোটা শুরু করল। দুরন্ত এক ভয় যেন তাদের তাড়া করল।

কনিষ্ক চিৎকার করে বলল, "মিছিমিছি ছুটছেন। ভেবেছেন কি কোথায় যাবেন ? কত ঘণ্টা, কত কি.মি. পথ ছুটবেন ? ছুটতে-ছুটতে একসময় আপনারা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আপনাদের খিদে পাবে। তেষ্টা পাবে। অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। তারপর ? আমি কিন্তু কি.মি.র পর কি.মি. আপনাদের পেছনে ছুটে যাব। যতক্ষণ না হাঁফিয়ে উঠে থামছেন ততক্ষণ ধরব না আপনাদের। আমার ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা নেই, তেষ্টা নেই। আমার অক্সিজেনের দরকার হয় না। আমি এক হিউমানয়েড রোবট। বলুন। ছুটবেন ? ছুটুন তা হলে।" নির্বিকারভাবে কনিষ্ক বলল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল রানাডে আর ভানুবন্ত।

কনিষ্ক ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ক্যাসেটটা দিন।"

রানাডে ক্যাসেটটা বের করে দিল। সেটাকে পকেটে চালান করে দিয়ে খুব শান্তভাবে কনিষ্ক জিজ্ঞেস করল, "ডঃ প্রভাকরকে হত্যা করার জন্য আপনাদের কি গ্রেফতার করতে পারি ?"

সম্মোহিতের মতো মাথা নাড়ল রানাডে আর ভানুবন্ত, "হ্যাঁ।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কুহক

এই সেই বাড়ি

সালেমে এখনও আছে সেই ডাইনিদের বাড়ি

ডাইনি-হত্যার সবচেয়ে কুখ্যাত ও নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৯২ সালে।

মাঝে-মাঝেই সংবাদপত্রে ডাইনি-হত্যার খবর বের হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুদিন ধরেই মেয়েদের ডাইনি সন্দেহে নানাভাবে লাঞ্ছনা করা হয়েছে, এমনকী হত্যাও করা হয়েছে। মেয়েদের ডাইনি বলে চিহ্নিত করার পেছনে কাজ করেছে মানুষের অশিক্ষাপ্রসূত নানা কুসংস্কার ও ধারণা, যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আশ্চর্যের কথা, বিজ্ঞানের এই বিপুল অগ্রগতির যুগেও মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি মনের অন্ধকার, মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মাসুল দিয়ে যেতে হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষকে।

ডাইনি-হত্যার সবচেয়ে কুখ্যাত ও নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৯২ সালে। ম্যাসাচুসেট্স প্রদেশের সালেম গ্রাম, আজকের ডেনভার শহরের সামান্য দূরের এক ছোট্ট লোকালয়। এখানেই ঘটে গিয়েছিল সেই লজ্জাজনক ও বীভৎস ঘটনাটি।

ঔপনিবেশিকতাবাদ বিস্তারের গোড়ার দিকের সেই দিনগুলিতে লোকে বিশ্বাস করত, ভূত-প্রেত ওঝা-ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রতন্ত্রে। সালেম গ্রামের আটটি মেয়ে হঠাৎ একদিন অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল। প্রথমে দুটি মেয়ে ছটফট করতে লাগল, পরে বাকি ছ'জনও একই রকম ব্যবহার শুরু করল, যেন কোনও অলৌকিক শক্তি ভর করেছে তাদের ওপর। মৃগীতে আক্রান্ত রুগিরা যেমন ছটফট করে ও মূর্ছা যায়, অবিকল সেরকম লক্ষণ ফুটে উঠল তাদের আচরণে। পাগলের মতো গোঙাতে লাগল মেয়েগুলি, আছাড় খেতে লাগল মাটিতে, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে লাগল উঠোন জুড়ে। গ্রামের লোকেরা কী করবেন বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে গেলেন আতঙ্কে। শেষপর্যন্ত ডেকে আনা হল গ্রামের ওঝাকে। ওঝার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা জানাল যে, গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধা নাকি ডাইনি, তাঁরাই তাদের তুকতাক করেছেন। মেয়েদের দলটির মধ্যে দু'জন তো সরাসরি তিনজন বৃদ্ধাকে নাম করে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করল। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামবাসীদের মধ্যে। সেই তিনজন বৃদ্ধাকে ধরে আনা হল। তাঁদের মধ্যে দু'জন অস্বীকার করলেন সমস্ত অভিযোগ। কিন্তু তৃতীয় বৃদ্ধার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি জাতীয় কিছু একটা আদায় করা গেল। তিনি জানালেন, গ্রামের বেশ কিছু লোক আছেন এই চক্রে, তাঁদের তিনি 'শয়তানের অনুচর' বলে চিহ্নিত করলেন। খুঁজেপেতে ধরা হল সেইসব শয়তানের অনুচর'-কে। তাঁদের যখন নিয়ে আসা হল মেয়েগুলির কাছে, তাদের অস্থিরতা যেন আরও বেড়ে গেল। যেন ভীষণ ত্রাসে ও আতঙ্কে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল তাদের, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। একের পর এক লোককে ডাইনি বা শয়তানের অনুচর ইত্যাদি অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলে পোরা হতে লাগল। সব মিলিয়ে ধরা হল ২০০ জনকে। শেষে ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছল যে, লোকে সর্বত্রই দেখতে লাগলেন 'শয়তানের অশুভ ছায়া', সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরনো কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। এমনকী, বেড়াল-কুকুর দেখেও মানুষ ভাবতে লাগলেন 'ছদ্মবেশী শয়তান'। কিন্তু ব্যাপারটা থেমে রইল না এখানেই। 'ডাইনি খোঁজা' এতদূর গড়াল যে, শেষপর্যন্ত ম্যাসাচুসেট্সের প্রশাসক বাধ্য হলেন বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে। তদন্তের কাজ চালানোর জন্য একটি বিশেষ উচ্চপর্যায়ের আদালত বসানো হল। দীর্ঘদিন বিচার চলার পর আদালত ১৯ জন বন্দিকে ডাইনিবিদ্যার অপপ্রয়োগের দায়ে অভিযুক্ত করল। গোটা নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে সব মিলিয়ে ৩৪ জনকে ডাইনি অভিযোগে চালান করা হল জেলখানার অন্ধকারে।

বন্দিদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা, সামান্য কয়েকজন অবশ্য পুরুষও ছিলেন। জেলের মধ্যেই মারা গেলেন নিরপরাধ সেই অসহায় মানুষগুলি, মানুষের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার মূল্য হিসেবে তাঁদের জীবন দিতে হল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরই সংবিৎ ফিরল প্রশাসনিক কর্তাদের। ভিত্তিহীন আতঙ্কের ফল কী মারাত্মক হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারলেন সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার পরে আর কখনও ডাইনি সন্দেহে হত্যার নির্দেশ সরকারিভাবে জারি করা হয়নি আমেরিকায়। কিন্তু সালেমের সেই ঘটনা পৌঁছে গেছে ইতিহাসের পাতায়। অনেকের মতে, রক্ষণশীল মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামিই দায়ী ছিল সেই মারাত্মক ঘটনার পেছনে। কারণ যাই হোক না কেন, আজকের সালেমবাসীরা কিন্তু ভুলতে পারেননি সেদিনের ঘটনা।

সালেমে এখনও রয়েছে সেই ডাইনিদের বাড়িটি, তার সামনে আজ স্থানীয় মানুষ ডাইনি-খোঁজার কাহিনী লেখা পোস্টার বিক্রি করেন উৎসুক দর্শনার্থীদের। বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলার তাঁর 'দ্য ক্রুসিব্ল' নাটকে ব্যবহার করেছেন সালেমের সেই কাহিনী।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) এখনকার এক জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক, যিনি 'মানব মিত্র' ছদ্মনামে বেশ কিছু পত্রিকায় একসময় নিয়মিত লিখেছেন। নাম বলতে পারো ? **শুচিশুভ্রা রায়**, পশ্চিমপাড়া, রহড়া।

(২) তিনবার ফুটবলে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান, কিন্তু একবারও বিশ্বকাপ জেতেনি কোন দেশ ? **সঞ্জয় দাস**, চন্দননগর, হুগলি।

(৩) সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল নাম কী ? **সৃজনকুমার বসাক**, কুতবপুর, মালদা।

(৪) মহিলাদের জন্য ওলিম্পিক গেমসের দরজা খুলে দেওয়া হয় কত সালে ? **বর্ণিনী চন্দ**, পুড়াটুলি, মালদা।

(৫) ভারতের সবচেয়ে পুরনো ফুটবল ক্লাব কোনটি ? **বাবন কর**, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

(৬) ভারতীয় রাজনীতিতে 'দ্য ফার্স্ট কমনার' কাকে বলা হয় ? **রাজশ্রী দাস**, রামচন্দ্রপুর, হাওড়া।

(৭) উইম্বলডন টেনিসের প্রথম আসরে বিজয়ী কে হন ? **সুমন মুখোপাধ্যায়**, সাঁকরাইল, হাওড়া।

(৮) আমেরিকার জাতীয় পাখি কী ? **শৌভিক রায়**, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

(৯) 'মুক্তোর দ্বীপ' নামে ডাকা হয় কোন দেশকে ? **শিবেন্দু সাহা**, সন্তোষপুর, কলকাতা।

(১০) বিশ্বকাপ ফুটবলের একটি ম্যাচকে 'বার্নের যুদ্ধ' নামে ডাকা হয়। কোন ম্যাচ, বলতে পারো ? **অলয় রায়**, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।

(১১) গোয়েন্দা-গল্প 'মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' কার লেখা ? **শিলাদিত্য চক্রবর্তী**, আলিপুরদুয়ার।

(১২) বিশ্ববিখ্যাত কোন ফুটবলার ছেলেবেলায় গাড়ির কাচ মুছে পয়সা উপার্জন করতেন ? **অরূপরতন আইচ**, কোন্নগর, হুগলি।

(১৩) ১৯৯৩ সালের বুকার পুরস্কার পেয়েছেন কোন সাহিত্যিক ? **শুভব্রত সরকার**, ভেনাস স্কোয়ার, কোচবিহার।

(১৪) 'আর্ট অব ক্যাপটেন্সি' বইটি কোন ক্রিকেটারের লেখা ? **রথীন্দ্রনাথ দে**, কোন্নগর, হুগলি।

(১৫) গায়িকা অলকা নাদকার্নিকে আমরা কী নামে চিনি ? **নির্মলেন্দু চক্রবর্তী**, কোচবিহার।

(১৬) ভারতীয় ক্রিকেটে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাটি কী নামে পরিচিত ? **গুঞ্জন রায়**, পার্ক সার্কাস, কলকাতা।

(১৭) 'হুতোম প্যাঁচা' কার ছদ্মনাম ? **জয়ন্ত দত্ত**, নিউটাউন, জলপাইগুড়ি।

(১৮) সম্প্রতি সংসদ ভবনের সামনে স্থাপিত মহাত্মাজির মূর্তির ভাস্কর কে ? **মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ**, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

(১৯) ১৯৯৩ সালের 'কমাণ্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' পুরস্কার কে পেয়েছেন ? **শুভস্মিত গোস্বামী**, জলপাইগুড়ি।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) নিউমিসম্যাটিক্স।
(২) নাদিম শইফ ও শ্রাবণ রাঠোড়।
(৩) দীনবন্ধু মিত্র।
(৪) রুমানিয়ার জর্জ হ্যাজি।
(৫) দ্বিতীয় নেবুচাডনেজার-এর আমলে।
(৬) স্টিভেন কাপুর।
(৭) সঞ্জয় মঞ্জরেকর।
(৮) হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর।
(৯) অ্যালবার্ট রজার মুহ মিল্লা।
(১০) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লেসলি গেভেস।
(১১) মার্ক টুলি।
(১২) স্পিডরিস্কোপ।
(১৩) বালগঙ্গাধর তিলক।
(১৪) বেঙ্গল গেজেট।
(১৫) লন্ডন পুলিশ।
(১৬) গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী।
(১৭) সুনীল গাওস্কর।
(১৮) হানিফ মহম্মদ।
(১৯) জীবনানন্দ দাশ।
(২০) টাইটান।
(২১) বরিস পাস্তেরনাক।

শ্রাবণ নাদিম

জীবনানন্দ দাশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বালগঙ্গাধর তিলক

কুইজ

বিষয় : লেখিকা

প্রশ্ন

(১) 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' কাকে বলা হত ?

(২) ঔপন্যাসিক মেরি অ্যান ইভান্স সাহিত্যজগতে কী নামে পরিচিত ?

(৩) মেবারের রানি ছিলেন তিনি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত ভক্তিরসাত্মক গীতিকবিতা রচনার জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাম বলতে পারো ?

(৪) কিশোরী মেয়েটি লিখেছিল এক দুর্দান্ত ভূতের গল্প। পরে সেই মেয়েটিই বিয়ে করে এক প্রখ্যাত ইংরেজ কবিকে। কে সেই মেয়েটি ?

(৫) ১৯৯৩ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কে ?

(৬) 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' উপন্যাসত্রয়ীর লেখিকা কে ?

(৭) কোন লেখিকা যিনি একটিই উপন্যাস লিখেছিলেন, উপন্যাসটি পরে এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রেরও জন্ম দিয়েছিল ? মহিলা শেষপর্যন্ত এক মোটরদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

(৮) সাহিত্যজগতে 'থ্রি ব্রন্টি সিস্টার্স' নামে অভিহিত কারা ?

(৯) কোন ভারতীয় কবি স্বনামে ইংরেজিতে কবিতা লিখলেও মলয়ালি ভাষায় লেখেন মাধবী কুট্টি নামে ?

(১০) রুথ প্রাভের ঝাবওয়ালা ব্রিটেনের 'বুকার পুরস্কার' লাভ করেছেন কোন উপন্যাসের জন্য, যেটি পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ?

(১১) জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছে পঙ্গু অবস্থায়, বিয়ে করেছিলেন এক বিখ্যাত ইংরেজ কবিকে, এবং 'সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগিজ' নামে কিছু অসামান্য প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন এই মহিলা। তিনি কে ?

(১২) কোন বাঙালি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখিকা উপজাতির মানুষের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখে 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন ?

(১৩) কোন নোবেল-প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই লিখেছেন চিনের পটভূমিকায় ?

(১৪) 'স্কুলের সেই সবচেয়ে দুষ্টু মেয়েটি'-কে নিয়ে লিখেছেন কে ?

(১৫) কোন লেখিকার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'কালা গুলাব' ও 'রশিদি টিকেট' ?

(১৬) সুপারম্যান কমিকসের এক নারীচরিত্র সাংবাদিকতার জন্য পেয়েছেন পুলিৎজার পুরস্কার। তাঁর নাম বলতে পারো ?

(১৭) শিশুসাহিত্যের কোন কাল্পনিক চরিত্রের ১০০তম জন্মদিন পালিত হল এ-বছর ?

(১৮) বাংলায় লেখা প্রথম আত্মজীবনীটি এক মহিলার। বইটির নাম কী, লেখিকাই বা কে ?

(১৯) নোবেলজয়ী কোন সাহিত্যিক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ?

(২০) লেডি মালোয়ান ছিলেন এক নামজাদা রহস্য-উপন্যাসের লেখিকা। কোন নামে তিনি লিখেছিলেন সেইসব উপন্যাস ?

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

প্রশ্ন

(ক) এঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি সঙ্কলিত হয়েছে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে। এঁর নাম কী ?

(খ) রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা। এঁর নাম বলো।

(গ) সাংবাদিক ও লেখিকা। এঁর নাম কী ?

(ঘ) জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি। এঁর নাম বলো।

ছবির পরিচয় : (ক) ইন্দিরা দেবী। (খ) রাধারানী দেবী। (গ) মৃণাল পাণ্ডে। (ঘ) মহাদেবী ভার্মা।

অমৃতা প্রীতম

উত্তর : (১) সরোজিনী নাইডু। (২) জর্জ এলিয়ট। (৩) মীরাবাঈ। (৪) মেরি শেলি, পার্সি বিসি শেলির স্ত্রী, কিশোরী বয়সে লিখেছিলেন 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। (৫) টনি মরিসন, আমেরিকা। (৬) আশাপূর্ণা দেবী। (৭) মার্গারেট মিশেল, উপন্যাসটির নাম 'গন উইথ দ্য উইন্ড'। (৮) এমিলি, অ্যানে ও শার্লট ব্রন্টি। (৯) কমলা দাশ। (১০) 'হিট অ্যান্ড ডাস্ট'। (১১) এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্ত্রী। (১২) মহাশ্বেতা দেবী। (১৩) পার্ল এস. বাক। (১৪) এনিড ব্লাইটন। (১৫) অমৃতা প্রীতম। (১৬) লয়েস লয়েন। (১৭) বিয়াট্রিক্স পটার-এর পিটার র‍্যাবিট। (১৮) 'আমার জীবন', লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী। (১৯) নাদিম গার্ডিমার। (২০) আগাথা ক্রিস্টি।

গোয়েন্দা গল্প

ওহায়ওতে একেনবাবু

সুজন দাশগুপ্ত

তিনদিন হল নিউ ইয়র্ক থেকে কলম্বাসে বেড়াতে এসেছি, একেনবাবু এখনও দাড়ি কামিয়ে উঠতে পারেননি। ওঁর মুখে অবশ্য খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সবসময়েই থাকে। কিন্তু তার কারণটা অন্য। ওঁর ভোঁতা ব্লেডের একটা কালেকশন আছে! প্রতিদিন তার থেকেই একটা বেছে নিয়ে ক্ষৌরকর্ম সারেন। অনেক বুঝিয়েও ওঁকে নতুন ব্লেড কেনাতে পারিনি। বেশি বাধা দিলে বলেন, "কী হবে সার নতুন ব্লেডে, এই তো মুখের ছিরি!"

এইরকম সেন্টিমেন্টাল কথা শুনে বাধ্য হয়ে একটা অসত্য ভাষণ করতে হয়। বলি, "কেন মশাই, নিজেকে এত অসুন্দর মনে করেন কেন?"

কিন্তু আমিও জানি আর উনিও জানেন যে, সৌন্দর্যের পরীক্ষায় ওঁকে গ্রেস মার্কস দিয়ে পাশ করানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। বেঁটে, টিঙ-টিঙে, চোয়াড়ে টাইপের চেহারা। চুলগুলো উসকোখুসকো, খাড়া-খাড়া। জামাকাপড়গুলোর কোনওটার সঙ্গে কোনওটার সামঞ্জস্য নেই। একমাত্র যা মিল, সেটা হল সবক'টাই কোঁচকানো আর নোংরা। সবকিছু মিলিয়ে নিদারুণ আনইম্প্রেসিভ চেহারা! তার ওপর অফুরন্ত বাজে বকেন, আর লোকদের উলটোপালটা প্রশ্ন করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেন। এরকম একটি লোকের সঙ্গে কেন আমরা থাকি, সে নিয়ে আমার আর প্রমথর মধ্যে মাঝে-মাঝেই গবেষণা হয়। গবেষণাটা অবশ্য নিজেদের মজার জন্যই, কারণ এই এক বছরে একেনবাবুর সত্যিকারের মূল্যটা আমরা বেশ জেনে গেছি। এরকম একজন ক্ষুরধার ডিটেকটিভ নিউ ইয়র্কে আর একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। তবে গোয়েন্দাগিরি করতে একেনবাবু নিউ ইয়র্কে আসেননি। এসেছেন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ক্রিমিনোলজির ওপর রিসার্চ করতে। আর আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম যখন যোগাযোগ হয়, তখন তো আমি জানতামও না যে, উনি একজন গোয়েন্দা! সে-খবর 'ম্যানহাটানে মুনস্টোন' উপাখ্যানেই আমি বিশদ করে দিয়েছি। যাক সে-কথা। সংক্ষেপে, একেনবাবু, প্রমথ আর আমি তিনজনই নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়াই, আর প্রমথ ওখানে কেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করছে। যদিও একটু আগে লিখেছি যে, কলম্বাসে আমরা বেড়াতে এসেছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা নিছক বেড়ানো নয়। কাজের সূত্রে মাঝে-মাঝেই আমাকে কলম্বাসে আসতে হয়। এবার প্রমথ আর একেনবাবু আমার সঙ্গ নিয়েছেন। একেনবাবু কখনও আমেরিকার 'মিড ওয়েস্ট' দেখেননি। মিড ওয়েস্ট বলতে ওহায়ও, ইন্ডিয়ানা, মিশিগান—এই স্টেটগুলোকে বোঝায়। কলম্বাস হচ্ছে ওহায়ওর রাজধানী।

আমাদের কথা ছিল সকালে 'বব এভান্স' রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট খেতে যাব। প্রমথ ঘোষণা করল যে, একেনবাবু দাড়ি না কামালে ও যাবে না। প্রমথর এই গোয়ার্তুমির জন্যই দাড়ি না কামানোর রহস্যটা উদ্ধার হল। একেনবাবু কাচুমাচু মুখে জানালেন যে, ওঁর ব্লেডগুলো নিউ ইয়র্কে ফেলে এসেছেন। প্রমথ ধমকাল, "কী হাড়কেপ্পন লোক আপনি, একটা ব্লেড কিনতে পারেন না?"

"ক'দিন বাদেই তো ফিরে যাব সার।"

"তা বলে এ-ক'দিন দাড়ি কামাবেন না! নিন, আমার ব্লেডটা নিন।"

একেনবাবু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে ব্লেডটা নিয়ে দাড়ি কামাতে-কামাতে বললেন, "অ্যামেজিং ব্লেড সার আপনার, একেবারে ক্ষুরধার! দাড়ি কামাচ্ছি না মাখন কাটছি, বোঝার উপায় নেই।"

আমরা যে হোটেলে আছি সেখান থেকে বেরিয়ে রুট থার্টিথ্রি দিয়ে কয়েক মাইল গেলেই বব এভান্স রেস্টুরেন্ট। ওখানকার সসেজ খুব বিখ্যাত। আমরা ডিমের স্প্যানিশ স্টাইলের ওমলেট, সসেজ আর কফি নিলাম। খেতে-খেতে একেনবাবু মন্তব্য করলেন, "একটা জিনিস খেয়াল করেছেন সার যে, এখানে খাবার জায়গা একেবারে অসংখ্য! যেদিকে তাকান সেদিকেই রেস্টুরেন্ট। এখানকার লোকরা কি বাড়িতে রান্না করে না?"

কারণটা আমি জানতাম। কলম্বাস হচ্ছে আমেরিকার রেস্টুরেন্ট ক্যাপিটাল। বড় রেস্টুরেন্ট কোম্পানিগুলো নতুন কোনও খাবার বাজারে চালু করার আগে এখানে ট্রায়াল দেয়। এখানে খাবারটা যদি চলে, তা হলেই অন্যান্য শহরে সেগুলো চালু করে। কোম্পানিগুলোর ধারণা হচ্ছে যে, কলম্বাসে যদি কিছু চলে, আমেরিকার অন্যান্য জায়গাতেও সেটা খুব চলবে। কথাটা নিশ্চয় কিছুটা সত্যি। আমেরিকার অনেক বড়-বড় রেস্টুরেন্ট চেইন-এর শুরু এই কলম্বাস থেকে। এগুলো একেনবাবুকে জানাতেই উনি বললেন, "বাঃ, বেশ সায়েন্টিফিক থিঙ্কিং তো। কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা চলে না।"

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কারণ ইন্ডিয়াতে জিভের কোনও কমন

স্বাদ নেই সার। এই দেখুন, সাউথ ইন্ডিয়াতে চলবে ইড়লি দোসা, নর্থে মোগলাই খানা, কিন্তু কলকাতায় শাক-চচ্চড়ি। এখানকার হ্যামবার্গার বা পিৎসার মতো ইউনিভার্সাল কোনও খাবারই নেই!"

আমি একবার ভাবলাম কথাটার প্রতিবাদ করব। কিন্তু করলাম না। একেনবাবুর যা বাজে বকার স্বভাব। এই নিয়েই এক ঘণ্টা কান ঝালাপালা করে দেবেন। প্রমথও, দেখলাম, চুপ করে বসে আছে। একেনবাবু কিন্তু রেস্টুরেন্ট প্রসঙ্গ ছাড়লেন না। খানিক বাদেই বললেন, "যাই বলুন সার, একটা ভাল ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট কিন্তু এখানে দেখলাম না।"

"ক'টা ভারতীয় এখানে থাকে যে, গণ্ডায়-গণ্ডায় ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট থাকবে?" আমি বললাম।

"তা বললে শুনব কেন সার। এদিকে বলছেন এটা রেস্টুরেন্ট ক্যাপিটাল, অথচ ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নেই! কেন, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তো নিউ ইয়র্কে খুব চলে। তার মানে সার, ওরা আমেরিকার সবার কী ভাল লাগবে ঠিক জানে না!"

একেনবাবু সবকিছুই এমন তির্যকভাবে দেখেন যে, মাঝে-মাঝে বিরক্তি লাগে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়লাম না। প্রমথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতে থেমে গেল। আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। কিন্তু নাম বলতেই মনে পড়ল। ডক্টর অনাদি রায়। ওহায়ও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বায়োকেমিস্ট্রি পড়ান। গত বছর যখন এসেছিলাম তখন আলাপ হয়েছিল। সেবার ওঁকে দেখেছিলাম হাসিখুশি, উৎসাহে টগবগ করছেন। এবার মনে হল বেশ মিইয়ে গেছেন—একটু যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্তও। আমি প্রমথ আর একেনবাবুর সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতেই উনি কেমন একটু অদ্ভুতভাবে একেনবাবুর দিকে তাকালেন। আমি তাতে কিছুমাত্র অবাক হলাম না। কারণ, একেনবাবুকে দেখে সবারই এরকম একটা রিঅ্যাকশন হয়। ওঁর চেহারার সঙ্গে গোয়েন্দা প্রোফেশনটা একেবারেই বেমানান। প্রমথ আমার থেকে একেনবাবুকে নিয়ে অনেক বেশি হাসিঠাট্টা করে। তাই ডঃ রায়কে বলল, "আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি: উনি কিন্তু সত্যিই একজন ডিটেকটিভ। তবে ছদ্মবেশে আছেন!"

ডঃ রায় থতমত খেয়ে বললেন, "না, না, তা নয়। আসলে আমি একজন ডিটেকটিভই খুঁজছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন, কী ব্যাপার?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে ডঃ রায় যা বললেন তা এতই অবিশ্বাস্য যে, আমার মনে হল ভদ্রলোকের মাথায় একটু গণ্ডগোল হয়েছে। যাই হোক, ঘটনাটা হল যে, উনি এক মাস আগে মা-র মৃত্যুর খবর পেয়ে কলকাতা যান। কলকাতায় দিন কুড়ি ছিলেন। তারপর এখানে ফিরে এসে যখন কাজকর্ম শুরু করলেন, তখন হঠাৎ ওঁর মনে হতে লাগল যে, ওঁর অনুপস্থিতিতে কেউ বাড়িতে এসে ঢুকছে। প্রমথ জানতে চাইল যে, কী করে উনি সেটা বুঝলেন? উত্তরে ডঃ রায় বললেন যে, উনি বাড়ি ফিরে এসে দেখতেন যে, বাড়ির টুকিটাকি জিনিসগুলো যেন একটু অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছে! যেমন, অ্যাশট্রেটা উনি কফি-টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখতেন। একদিন বাড়ি ফিরে দেখেন, কেউ সেটা সরিয়ে টেবিলের কোনায় রেখেছে! দেশ থেকে দুটো ফুলদানি এনেছিলেন। সে-দুটো বুক-শেলফের ওপর দু'পাশে রাখা থাকত। সেগুলোও যেন একটু সরানো। কৃষ্ণনগরের একটা মাটির পুতুল ছিল আলমারিতে। সেটা তো ভেঙে টুকরো-টুকরো! ক্লজেটের ভেতর জামাকাপড়গুলোও একটু অবিন্যস্ত। প্রথমদিন ব্যাপারটাকে উনি উপেক্ষাই করেছিলেন। দেশ থেকে ফিরে ওঁর একটা জেট-ল্যাগ হয়। ফলে দু-একদিন এত ঘুম-ঘুম থাকে যে, সবকিছু ঠিকঠাক খেয়াল থাকে না। কিন্তু এর দু'দিন পর উনি যখন পুরোপুরি নর্মাল, বাড়ি ফিরে এসে দেখেন যে, ওঁর সুটকেস খুলে কেউ ঘেঁটেছে।' ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারের ভেতরগুলোও বেশ ওলটপালট। আর যেটা খুবই ডিস্টার্বিং সেটা হল, ওঁর নতুন কোলাপুরি চটিটা কেউ ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে গেছে!

"আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন সার?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"দিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ যখন শুনল কিছুই চুরি যায়নি, তখন আর পাত্তা দিল না। ওদের ধারণা আমি দরজা-জানলা খোলা রেখে কলেজে গেছি। আর পাড়ার কোনও দুষ্টু ছেলে ঘরে ঢুকে এই দুষ্কর্ম করেছে!"

"আপনার কী ধারণা সার?"

"আমার কোনও ধারণাই নেই! তবে আমি শিওর যে, দরজা-জানলা দুটোই আমি খুব ভালভাবে বন্ধ করে গেছি। প্রথমদিন

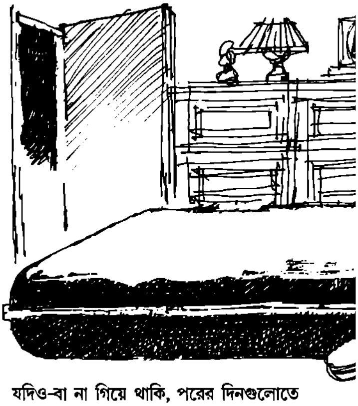

যদিও-বা না গিয়ে থাকি, পরের দিনগুলোতে নিশ্চয় গেছি।"

"ক'বার এরকম কেউ বাড়িতে ঢুকেছে বলে আপনার মনে হয় সার?"

"আমি দিনদশেক হল ফিরেছি। এর মধ্যে অন্তত বারচারেক কেউ ঢুকেছে শিওর।"

"আপনার বাড়ির চাবি কি আর কারও কাছে আছে?" এবার আমি প্রশ্নটা করলাম।

"না, একটাই চাবি। আর সেটা আমার কাছে।"

"কাউকে আপনি কখনও চাবি দেননি সার?"

"দিয়েছি। আমার এক কলিগ ও বন্ধু ডঃ সত্য গুপ্ত-কে। প্রতি বছর যখন দেশে যাই, ওঁকেই চাবিটা দিয়ে যাই। মাঝে-মাঝে এসে উনি দেখে যান বাড়িটা ঠিকঠাক আছে কি না।"

আমি দেখলাম প্রমথ একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আমাদের আবার সকালে কিংস আইল্যান্ড-এ বেড়াতে যাওয়ার কথা। কিংস আইল্যান্ড একটা খুব বড় অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, কলম্বাস থেকে গাড়ি করে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। আমি ডঃ রায়কে বললাম যে, আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে। বিকেলে ফিরে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। অ্যামিউজমেন্ট পার্কের কথাটা আর বললাম না, পাছে ভাবেন ওঁর দুর্গতিতে সাহায্য না করে আমরা মজা করতে যাচ্ছি!

কিংস আইল্যান্ডে যাওয়ার পথে প্রমথ মন্তব্য করল, "লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। নইলে এরকম অদ্ভুত ঘটনা কেউ কোনওদিন শুনেছে, চুরি না করে বাড়ির জিনিসপত্র ঘেঁটে চোর চলে যাচ্ছে!"

"হয়তো চুরি করার মতো পছন্দসই কিছু পায়নি।" আমি মজা করে বললাম।

"তোর মুণ্ডু! চোরের আবার পছন্দ অপছন্দ কী রে!" প্রমথ ধমক দিল।

একেনবাবু দেখলাম চুপচাপ। আমি ঠাট্টা করলাম,"কী মশাই, রহস্যের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন মনে হচ্ছে। আমাদের কথা কানেই তুলছেন না!"

একেনবাবু চমকে উঠে বললেন, "ছি ছি, কী যে বলেন সার, রহস্য আবার কোথায় পাব?"

প্রমথও ছাড়ল না। বলল, "আমাদের কথা একটু শুনলেই রহস্যের গন্ধ পেতেন।"

একেনবাবু কান চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, "আপনারা সার, দু'জনেই বড্ড ঠাট্টা করেন!"

কথাটা এমনভাবে বললেন যে, আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

কিংস আইল্যান্ড থেকে ফেরার পথে সারাটা পথ ভুট্টার খেত দেখতে-দেখতে একেনবাবু বললেন, "ধুস্, এখানে কিংস আইল্যান্ড ছাড়া আর কিছু নেই সার।"

আমি বললাম, "মিডওয়েস্টে ভুট্টার খেত ছাড়া আপনি আর কী আশা করেছিলেন?"

"কে জানে সার। তবে যাই বলুন, আমাদের নিউ ইয়র্কই ভাল।"

এটা কিন্তু একেনবাবুর একটা পরিবর্তন। এতদিন বলতেন, 'আপনাদের নিউ ইয়র্ক'। প্রমথ ঠাট্টার লোভ সংবরণ করতে পারল না। বলল, "বাঃ, যেই নিউ ইয়র্ক ভাল হল, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা আমাদের নিউ ইয়র্ক হয়ে গেল। আর খারাপ হলেই আপনাদের নিউ ইয়র্ক।"

"কী যে বলেন সার!" বলে একেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। ওঁর এই বদ অভ্যাসটা আমি আর প্রমথ এতদিন চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। যখন-তখন সিগারেট ধরাবেন। সিগারেট যে ওঁর শরীরের পক্ষে খারাপ, শুধু তাই নয় যারা ওই ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকছে তাদের পক্ষেও যে খারাপ, হাজারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা হল, আজকাল ধোঁয়াটা ছাড়েন মুখ ঘুরিয়ে, যাতে সোজাসুজি আমাদের নাকে এসে না লাগে। ভাবটা, তাতেই ওঁর দায়িত্ব খতম! গাড়িতে বসে আছি বলে গাড়ির কাচ নামিয়ে বাইরে ধোঁয়াটা ছাড়লেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "কী সার, একবার ডঃ রায়ের ওখানে যাবেন নাকি?"

প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। "কোন ডঃ রায়?" বলেই অবশ্য খেয়াল হল যে, অনাদি রায়ের কথা উনি বলছেন। তখন বললাম, "আপনি ডঃ অনাদি রায়কে সিরিয়াসলি নিয়েছেন নাকি? আমার তো মনে হল একটু খ্যাপা লোক?"

প্রমথ মন্তব্য করল, "একটু-আধটু নয়, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। আপনারা যান তো যান। আমি হোটেলে ফিরে বিছানায় চিতপাত হচ্ছি।"

আমারও খুব টায়ার্ড লাগছিল। তাই একেনবাবুকে বললাম, "কেন সময় নষ্ট করবেন খামোখা!"

"কিন্তু ভদ্রলোককে যে বললেন ফিরে এসে যোগাযোগ করবেন? উনি নিশ্চয় অপেক্ষা করে বসে থাকবেন সার?"

কী মুশকিল! এরকম তো কত লোককেই আমি কত কথা বলি! সব কথাই রাখতে আছে? কিন্তু কে একেনবাবুকে তা বোঝায়! এমন ঘ্যান-ঘ্যান শুরু করলেন যে, বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে ডঃ রায়কে ফোন করলাম।

ডঃ রায় ফোন পেয়ে খুব খুশি। "এক্ষুনি আসুন," বলে বাড়ির ডিরেকশন দিয়ে দিলেন।

ডঃ রায়ের বাড়ি কলম্বাসের শহরতলি ওয়ার্দিংটনে। পৌঁছতে-পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। ডোর-বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন ডঃ রায়। বাইরের ঘরটা বিরাট। আর তার ঠিক মাঝখানে বেশ বড় চৌকো কফি-টেবিল ঘিরে একটা সোফা-সেট, আর একটা লেজিবয় চেয়ার। কফি-টেবিলের ঠিক মাঝখানে চিনেমাটির একটা বিশাল অ্যাশট্রে। একেনবাবু কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ অ্যাশট্রেটা উলটেপালটে খানিকক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, "এটা কি নতুন কেনা সার?"

আমরা একেনবাবুকে চিনি বলে আজকাল ওঁর ব্যবহারে আর আশ্চর্য হই না।

কিন্তু ডঃ রায় একটু থতমত খেয়ে বললেন, "না, ঠিক নতুন নয়। গত বছর তাইওয়ান থেকে কিনেছিলাম।"

একেনবাবু দুলে-দুলে মাথা নাড়লেন, "ঠিক, এই তো 'মেড ইন তাইওয়ান' লেখা। এক বছরের পুরনো বললেন সার, তাই না? কিন্তু দেখতে একদম নতুন। মনে হয় যেন ব্যবহার করাই হয়নি।"

ডঃ রায় আমার দিকে একবার তাকালেন। ভাবটা, কার পাল্লায় পড়েছি! মুখে বললেন, "তা একদিক থেকে নতুনই। বহুদিন বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে ছিল। এবার দেশ থেকে ফিরে পুরনো অ্যাশট্রেটা খুঁজে না পেয়ে এটাকে বের করেছি।"

"খুঁজে পাননি মানে? ওটা কি চুরি হয়েছে নাকি সার?"

"চুরি হতে যাবে কেন? আমার বন্ধু, ডঃ সত্য গুপ্ত, মানে যাকে আমি অ্যাপার্টমেন্টটা দেখাশোনা করতে বলেছিলাম, তিনি ওটাকে নিয়ে গেস্টরুমে রেখে দিয়েছিলেন। তাই খুঁজে পাইনি।"

আমি চিনেমাটির অ্যাশট্রেটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ সকালে কি এই অ্যাশট্রের কথাই বলছিলেন যে, এটাকে সরিয়ে কেউ অন্য জায়গায় রেখেছিল?"

"অন্য জায়গা মানে টেবিলের ওপরই ছিল। তবে আমি যেরকম ঠিক মাঝখানে এটাকে রাখি, সেখানে ছিল না। এটা ছিল টেবিলের একদম সাইডে।"

"আপনি শিওর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কী শিওর?"

"মানে টেবিলের ঠিক মাঝখানে অ্যাশট্রেটা রেখে গিয়েছিলেন।"

"নিশ্চয়!" ডঃ রায় মনে হল আমার প্রশ্নে একটু বিরক্ত। "আমি কোনও কিছু অগোছালো অবস্থায় রাখি না। ঘুরে দেখুন না, প্রত্যেকটি জিনিস এ-বাড়িতে গুছিয়ে রাখা।"

কথাটা ডঃ রায় ভুল বলেননি। আমি দেখলাম, ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে দরজার ফ্লোর ম্যাট পর্যন্ত সবকিছু নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা। সবকিছুর মধ্যেই একটা সিমেট্রি। কফি, টেবিলে শুধু অ্যাশট্রেটা রয়েছে। তাই সেটা টেবিলের ঠিক মাঝখানে। বুককেসের ওপর দুটো ফুলদানি যেন মেপে দু'পাশে রাখা। তিন দেওয়ালে তিনটে ছবি, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি আর একজন অচেনা মহিলার। প্রতিটাই

টাঙানো হয়েছে দেওয়ালের ঠিক মাঝ-বরাবর—একই রকম উঁচুতে। একেনবাবু উঠে ফুলদানিটা একটু পরীক্ষা করলেন। ওঁর দেখাদেখি আমিও বিজ্ঞের মতো দ্বিতীয় ফুলদানিটা হাতে তুললাম। পেতলের ওপর সূক্ষ্ম কাজকরা ফুলদানি, দামি ফুলদানি যেমন হয়। একেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কৃষ্ণনগরের যে পুতুলটা ভেঙে গিয়েছে সেটা কোথায় ছিল সার ?"

"আলমারিতে। ঠিক এইখানটাতে।" বলে ডঃ রায় কাচের আলমারির তৃতীয় তাকটা দেখালেন। সেখানে দেখলাম অজস্র পুতুল সাজানো। বেশিরভাগই স্পেন বা সাউথ আমেরিকায় তৈরি মনে হল।

"নাঃ, ভারী কনফিউসিং।" একেনবাবু ঘাড় ঘষতে-ঘষতে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বললেন।

কনফিউসিং বলে কনফিউসিং। কেউ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘেঁটে ফেলে চলে যাচ্ছে, অথচ কিছু চুরি করছে না। এক হতে পারে কিছু খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। কিন্তু কী খুঁজছে ?

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এবার দেশ থেকে আপনি মূল্যবান কিছু এনেছেন ?"

"কিচ্ছু না। এবার মা-র মৃত্যুর খবর পেয়ে দেশে গিয়েছিলাম। কেনাকাটা করার মানসিক অবস্থা ছিল না।"

"একেবারে কিছুই আনেননি সার ! ভাল করে ভাবুন তো !"

ডঃ রায় একমুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "ও হ্যাঁ, আনার মধ্যে কৃষ্ণনগরের পুতুলটা এনেছিলাম, সেটা তো ভেঙেই গেল। তাও নিজে কিনিনি। এক বন্ধু উপহার হিসেবে দিয়েছিল বলেই নিয়ে এসেছিলাম।"

হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জিজ্ঞেস করলাম, "আর কারও জন্য কিছু এনেছিলেন ?"

"না।" কথাটা ডঃ রায় বললেন কিন্তু মনে হল একটু অন্যমনস্ক। একেনবাবুর চোখ সেটা এড়াল না। বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা চিন্তা করছেন।"

"না, না, চিন্তা কিছু নয়। হঠাৎ মনে পড়ল প্রতিবার যখন দেশে যাই, আমার বন্ধু ডঃ গুপ্তর জন্য একটা প্যাকেট আনি। এবার সেটাও আনিনি।"

"ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না সার। কিসের প্যাকেট, আর কেন আনেননি ?"

"কিসের প্যাকেট তা তো জানি না। তবে প্রতিবার ডঃ গুপ্তের বন্ধু বিজয় শেঠ আমার সঙ্গে একটা প্যাকেট পাঠান। এবার কিন্তু দেননি। শুধু একটা চিঠি দিয়েছেন।"

"চিঠিতে কী লেখা ছিল আপনি বোধ হয় জানেন না সার—তাই না ?" একেনবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে প্রশ্নটা করলেন।

আমাদের অবাক করে ডঃ রায় বললেন, "না, জানি। লিখেছিলেন যে, এবার আর কিছু পাঠাচ্ছেন না।"

একেনবাবু বললেন, "লাস্ট কোয়েশ্চেন সার। ডঃ গুপ্তর বন্ধু বিজয় শেঠ কী করেন ?"

"তা তো ঠিক জানি না। আমি ওঁর বাড়িতেই শুধু গেছি। আলিপুরে থাকেন। আমার ধারণা বিজনেসম্যান।"

ফেরার পথে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী গোয়েন্দামশাই, কী বুঝছেন ?"

একেনবাবু উত্তর না দিয়ে বললেন, "দেখছেন সার, এখানকার হাইওয়েগুলো কীরকম ফাঁকা ? সারা শহর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্কে এটা ভাবাই যায় না !"

আমি বললাম, "কথা এড়াচ্ছেন কেন ? বলুন কী বুঝলেন ? ডঃ রায় কি পাগল, না সত্যি-সত্যিই ওঁর বাড়িতে কিছু একটা ঘটছে ?"

"কে জানে সার, তবে বড্ড কনফিউসিং !"

পরদিন সকালে একেনবাবু ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা খুলে হুলুস্থুলু বাঁধালেন, "কী আশ্চর্য সার, ওহায়ও স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস যে আমেরিকার সবচেয়ে বড়, সেটা তো জানতাম না ?"

প্রমথ বলল, "জানলে কী হাতি-ঘোড়া হত শুনি ?"

"না, তা নয় সার। তবে ক্যাম্পাসটা একবার ভাল করে দেখা উচিত। হাজার হোক নাম্বার ওয়ান তো !"

প্রমথ বলল, "আপনি গেলে বাপিকে নিয়ে যান মশাই, আমি যাচ্ছি না। এখানকার সব কলেজ ক্যাম্পাসই এক। বড়-বড় বাড়ি আর মাঠ !"

এইসব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ডঃ রায়ের ফোন। ফোনে কী বললেন জানি না, কিন্তু একেনবাবু দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সে কী সার, এটাই আমাকে বলেননি ! একটু ভেবে বলুন তো, এমন কিছু আপনি এনেছেন যেটা জোগাড় করার ব্যাপারে উনি কিছু সাহায্য করেছেন। ...বেশ, ওটাই নিয়ে চলে আসুন।"

ফোন নামাতেই আমি আর প্রমথ বললাম, "কী ব্যাপার ?"

"আর বলবেন না সার, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টটাই উনি কাল বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

"কী পয়েন্ট ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওই যে সার বলেছিলেন যে, বিজয় শেঠ এবার কিছু পাঠাচ্ছেন না। বিজয় শেঠ সেটা ঠিক লেখেননি। লিখেছিলেন, 'এবার আলাদা করে কিছু পাঠাচ্ছেন না।' বিগ ডিফারেন্স সার, ভেরি বিগ ডিফারেন্স !"

প্রমথকে আমি ডঃ রায়ের বাড়িতে যা-যা কথা হয়েছে বিস্তারিত বলেছি। তাই প্রমথ চট করে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বলল, "তার মানে যা পাঠাবার সেটা অন্যকিছুর সঙ্গে পাঠাচ্ছেন !"

"এগজ্যাক্টলি সার ! এক্ষুনি জানতে পারলাম যে, ডঃ রায় ওঁর মায়ের ছবিটা বিজয় শেঠেরই এক পরিচিত লোককে দিয়ে ফ্রেম করিয়েছেন। আমার ধারণা সার, ফ্রেমের মধ্যে আমরা কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি।"

"আপনি মশাই অনাবশ্যক রহস্য খুঁজছেন," আমি বললাম। "বরাবর ভদ্রলোক আলাদা করে প্যাকেট পাঠিয়েছেন। এবারও সেটা পাঠালে হাতি-ঘোড়া কী হত ?"

"নিশ্চয় কোনও কারণ ছিল সার। হয়তো পুলিশের ওঁর ওপর সন্দেহ হয়েছে। তাই নিজের হাতে কিছু দিতে চাননি।"

ডঃ রায় কিছুক্ষণের মধ্যেই এলেন। সঙ্গে ওঁর মায়ের ছবি। ওই ছবিটাই বাইরের ঘরের দেওয়ালে দেখেছিলাম। একেনবাবু ফ্রেমের পেছনটা খুলতেই আমরা সবাই থ' ! কার্ডবোর্ডের পেছনে আঠা দিয়ে আটকানো কম-সে-কম তিরিশ-চল্লিশটা হিরের টুকরো !

"কী দেখছেন সার," একেনবাবু ডঃ রায়কে বললেন, "আপনার বন্ধু ডঃ গুপ্ত হচ্ছেন একজন স্মাগলার। আপনার মতো নিরীহ লোকদের ঘাড় ভেঙে উনি স্মাগলিং চালাতেন।"

"মাই গুডনেস, একজন ওয়েল এজুকেটেড ম্যান !" ডঃ রায় আর কিছু বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, "বিজয় শেঠ চিঠিতে ছবিটার কথা লিখলেন না কেন, তা হলে ডঃ গুপ্তকে কৃষ্ণনগরের পুতুলটাও ভাঙতে হত না, কোলাপুরি চটিটাও কাটতে হত না। ধরে নিচ্ছি হিরে খুঁজতেই ওই কীর্তিগুলো উনি করেছেন।"

একেনবাবু বললেন, "খেপেছেন সার, সেটা লেখা যায় নাকি ! চিঠিটা যদি পুলিশের হাতে পড়ত !"

ছবি : অনুপ রায়

গোয়েন্দা শার্লক হোমস

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্রাঙ্ক জভেলো

গোয়েন্দা শার্লক হোমস্

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্র্যাঙ্ক ছকোলা

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টিনটিন * হার্জে

ঠকাস
ঢের কাজ হয়েছে ! ... ভাগ্য ভাল আমাকে আগে ডেকেছিল... এবার বদমাশদের মুখগুলি দেখা যাক !
ফকির, একটা জাপানি, মিঃ আর মিসেস স্নোবল, যে-কর্নেল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, এবং মহারাজার সচিব... অবিশ্বাস্য ব্যাপার !
?
সে কি ! টিনটিন !! ...এখানে !!!
কী স্পর্ধা, ভেবেছে বেঁধে রাখবে... আমার মতো মন্ত্রসিদ্ধ ফকিরকে !
অ্যাঁ ! ফকিরটা পালিয়েছে !
ক্লিক
সর্বনাশ ! ওকে কিছুতেই পালাতে দেব না !
দড়াম
হা-হা ! এবার সত্যিই তোমাকে বাগে পেয়েছি !

ফারাওয়ের চুরুট

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

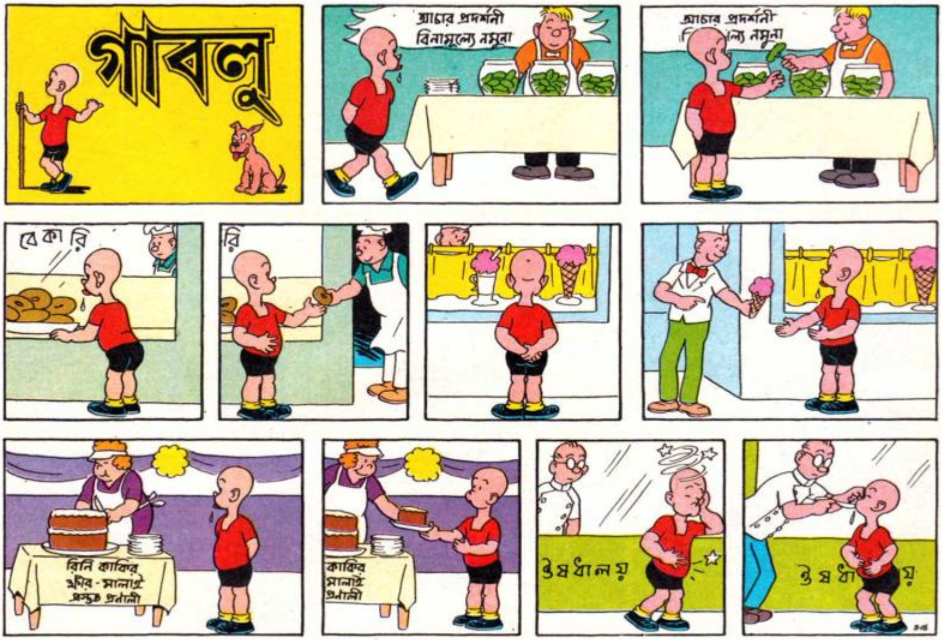
গাবলু
আচার প্রদর্শনী
বিনামূল্যে নমুনা
বেকারি
রিনি কাকির
ক্ষীর-মালাই
প্রস্তুত প্রণালী
ঔষধালয়

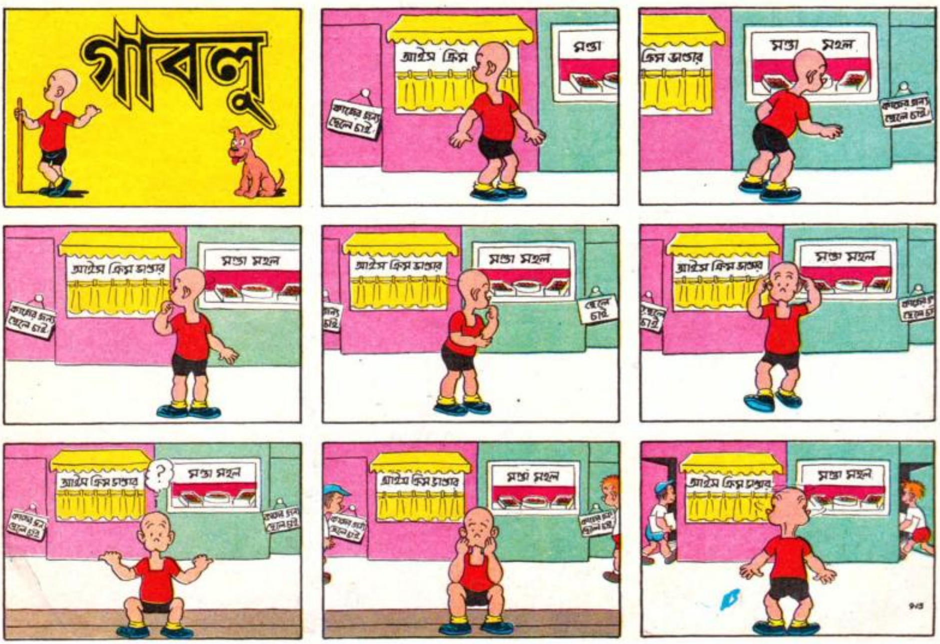
গাবলু
আইস ক্রিম
সস্তা
কাজের জন্য
ছেলে চাই
আইস ক্রিম ভাণ্ডার
সস্তা মহল

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

শিউলি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শিবশঙ্কর বেশ জমিয়ে বসলেন কার্পেটের ওপর। চেয়ার বা সোফায় বসে গল্প ঠিক জুতসই হয় না। জয়া দাদির সেই প্রিয় তাকিয়াটা এনে দিল। জয় নিয়ে এল জলের বোতল। খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে শিবশঙ্কর জল খান। সেইটাই হল স্বাস্থ্যকর নিয়ম। ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। পরিবেশটা গল্পের। কাচের দরজার বাইরে গাছপালা। রাতের অন্ধকার আকাশ।

শিবশঙ্কর শুরু করলেন, "'ব্ল্যাক হোল'-এর নাম শুনেছ তোমরা ?"

"শুনেছি দাদি, কিন্তু ঠিক বুঝিনি।"

"তা হলে একটু পেছন থেকে শুরু করি। আলো জিনিসটা কী ?"

জয় খুব বুদ্ধিমানের মতো বলল, "অন্ধকারের উলটোটাই হল আলো।"

শিবশঙ্কর বললেন, "ভালই বলেছ দাদু, তবে ব্যাখ্যাটা অত সহজ নয়। দুটো মত আছে। প্রায় দুশো বছরের পুরনো। নিউটনের মত হল, আলো হল কণার সমষ্টি, পার্টিক্‌ল। কণা দিয়ে তৈরি। কণার প্রবাহ। ওই সময়ের আর-একটা মত, আলো হল তরঙ্গ, ঢেউ। তখন এই নিয়ে সংশয় ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুটোই ঠিক। আলো ঢেউ, আলো কণা। এখন বিজ্ঞানীমহলে তর্ক শুরু হল, আলো যদি শুধু ঢেউ বা তরঙ্গ হয়, তা হলে মাধ্যাকর্ষণ কেমন করে কাজ করবে ! বস্তুকে আকর্ষণ করা যায়, বস্তুহীন তরঙ্গ কেমন করে আকৃষ্ট হবে ! কিন্তু আলো যদি বস্তুকণা হয় তা হলে গ্র্যাভিটি কাজ করবে। যেমন কামানের গোলা, রকেট, প্ল্যানেট। একদল বললেন, আলোর কণা এত জোরে ছোটে যে, গ্র্যাভিটি সেই গতিকে মন্থর করতে পারে না। তখন রোয়েমারের আবিষ্কার প্রমাণ করল, আলোক তরঙ্গের গতি অসীম নয়, তারও একটা সীমা আছে। তার মানে আলো মাধ্যাকর্ষণকে এড়াতে পারে না। গ্র্যাভিটি আলোর ওপর কাজ করে। বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন। জয় তোমাকে বলছিলুম, এই পৃথিবীতে মানুষের কাজের শেষ নেই। খড়ক সিং চায়ের দোকান করেছে বলে, চা করাটাই একমাত্র কাজ, তা নয়। যার মাথা আছে সে মাথার কাজ করবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন মিচেল সেই ১৭৮৩ সালে এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায়। লিখলেন, যেসব তারা

১		২	৩		■	■	৪		৫
	■	৬		■	■	৭		■	
৮			■	৯	১০	■		■	
	■	■	১১			১২	■	১৩	
১৪	১৫			■	১৬		■		■
■		■	১৭	১৮	■	১৯			২০
২১		■	২২		২৩		■	■	
	■	২৪	■	২৫		■	২৬		
	■	২৭		■	■	২৮		■	
২৯			■	■	৩০				

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) এর ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায়। (৪) —নয়, মনের বাঘেই খায়। (৬) নিযুক্ত। (৭) বঙ্গবালার প্রিয় অলঙ্কার। (৮) এর অভাবে মামলা ফেঁসে যায়। (৯) —থাকলেও সাধ্য থাকে না। (১১) লঙ্কাভাগের পরিকল্পনা এর মাথায় এসেছিল। (১৩) এ মত্ত হলে পদ্মবনের দুরবস্থা। (১৪) গ্রামসমষ্টি। (১৬) —দুঃখেও ভেঙে পড়তে নেই। (১৭) সংসারে এর চেয়ে বড় কেউ নেই। (১৯) সম্পূর্ণ নষ্ট। (২১) এর একটুও ভাল। (২২) মালা গাঁথার ওস্তাদ। (২৫) শলাকা। (২৬) করুণাময়ী দুর্গার এক নাম। (২৭) দুর্গার সখী। (২৮) বড় নদী। (২৯) সাপের শত্রু। (৩০) দয়ালু।

উপর-নীচ : (১) জ্বালিয়ে পুজার সময়ে দেবদেবীর আরতি করতে হয়। (২) —নিতে হলে ঈশ্বরের চরণই স্থান। (৩) যত—, তত পথ। (৪) বলা বাহুল্য এটি বলরামের ডাকনাম। (৫) রসিক শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়। (৯) অন্ধ। (১০) কুবের। (১১) নেই মামার চেয়ে ভাল। (১২) বরের পাশে শোভা পায়। (১৩) গুজরাতের বিখ্যাত নৃত্যগীত। (১৫) আমগাছ। (১৮) —করলেও বালুবেলায় হারানো মুক্তো পাওয়া যায় না। (২০) হলঘর। (২১) এর বোঝা ভগবান বহন করেন। (২৩) কাল। (২৪) ভেজা। (২৬) নৌকো ছাড়বার সময়ে এই পীরের নাম করেন মাঝি। (২৮) না।

গত সংখ্যার সমাধান

■	■	বা	ম	ন	■	■	ক	পা	ল
পা	থ	র	■	ব	ক	ল	ম	■	ঙ্গ
ক	■	বে	ড়া	জা	ল	■	লা	ল	ন
চ	প	লা	■	ত	ত্র	■	স	■	■
ক্র	য়	■	ডা	ক	■	কা	না	ই	■
■	সা	মা	ল	■	ন	য়	■	লা	ই
■	■	ল	■	আ	য়	■	র	হি	ত
গ	র	ম	■	ম	ন	স্কা	ম	■	স্ত
স্তা	■	স	র	সি	জ	■	র	চি	ত
র	ঙ্গি	লা	■	■	ল	হ	মা	■	■

আকারে বিশাল এবং নিরেট ঘন, সেইসব তারার অভিকর্ষ-ক্ষেত্র বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ভীষণ শক্তিশালী। এমন আকর্ষক ক্ষমতা যে, সেইসব তারা আলো ছিটকে বাইরে আসতে পারে না। আলোর রশ্মি বাইরে আসতে চাইলেই টেনে ধরে রাখে। মিচেল বললেন, এইরকম অনেক অন্ধকার তারা আকাশে আছে যার আলো দেখা যায় না ; কিন্তু আকর্ষণ অনুভব করা যায়। অনেকটা এইরকম, অন্ধকারে বাবু বসে আছেন সোফায়। হাত ধরে টানছেন ; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। এই রকমের তারাকেই বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন ব্ল্যাক হোল। সত্যিই তাই, মহাকাশে অন্ধকার শূন্যতা। বস্তু অদৃশ্য অথচ আকর্ষণ বিশাল। কয়েক বছর পরে এক ফরাসি বিজ্ঞানী মার্কুইস দ্য লাপ্লেস ঠিক এই একই সিদ্ধান্তে এলেন নিজের চিন্তা ও ভাবনায়। মিচেলের গবেষণা তিনি জানতেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে এইসব থিয়োরি একেবারে বাতিল হয়ে গেল। ফিরে এল ওয়েভ থিয়োরি। আলো বস্তুকণা নয়, তরঙ্গ। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন নিয়ে এলেন জেনারেল রিলেটিভিটি। বড় হলে তোমরা পড়বে। এর পর আরও কিছুকাল গেল, শেষে জানা গেল বিশাল ওজনদার তারার রহস্য। সেই জটিল বিজ্ঞান তোমরা এখনই বুঝতে পারবে না। তবে এইটুকু জেনে রাখো, এক-একটা তারা যেন হাইড্রোজেন বোমা। তারার জন্ম হল গ্যাস থেকে, যার বেশির ভাগটাই হল হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন অ্যাটম একটা আর-একটার ঘাড়ে এসে চাপছে। সেও তোমার অভিকর্ষের খেলা। আমি তোমাকে টানছি, তুমি আমাকে টানছ। গ্যাস যত সঙ্কুচিত হতে থাকে ততই এই ধাক্কাধাক্কি, সঙ্ঘর্ষের গতি বেড়ে যায়। অণুতে-অণুতে ঠোকাঠুকি। মত্ত মাতামাতি। এই ঠোকাঠুকিতে উত্তাপ বাড়বে, ক্রমশই বাড়বে। শেষে ওই গ্যাসের বলয় এতটাই উত্তপ্ত হবে যে, হাইড্রোজেন অণু ধাক্কাধাক্কিতে আর ছিটকে যাবে না, একটার সঙ্গে আর-একটা জড়িয়ে তৈরি করবে হিলিয়াম। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হওয়ার সময় যে উত্তাপ তৈরি হবে, তা ওই হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের উত্তাপ। আর এই কারণেই তারা আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। এইসঙ্গে আরও এক মজার ব্যাপার হয়। গ্যাসের একটা বেলুন তৈরি হয়। প্রচণ্ড উত্তাপে গ্যাসের ভেতরের চাপ বাড়তে থাকে, এক সময় আকর্ষণ আর বিকর্ষণের শক্তি এক হয়ে তৈরি হয় উত্তপ্ত, জ্যোতির্ময় গ্যাস বলয়। রবারের বেলুনের মতো একটা ব্যাপার। ভেতরের বাতাস চাইছে আরও ফুলতে, আর রবারের শক্তি সেই ফোলাটাকে আটকে রাখছে। এইভাবে এক-একটা তারা হাজার-হাজার, কোটি-কোটি বছর ধরে তার জ্বালানির সঞ্চয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। প্রত্যেকটাই এক-একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার হাউস।

"সে তো হল ; কিন্তু এইসব হল কখন, কী করে হল, কেন হল, কেই-বা হওয়ালেন। এর কর্তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমার কারখানায় বসে আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছি। জয়া রান্নাঘরে বসে রাঁধছে। জয় বাগানে গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ছে, পৃথিবীটাকে আমরা যখন থেকে দেখছি, তখন থেকেই এই একই দৃশ্য। কাজের পেছনে কেউ-না-কেউ একজন আছে। কেউ না থাকলে আমরা বলি ভূতের কাণ্ড। আকাশের দিকে তাকালে দেখি গ্রহ, সূর্য, চন্দ্র, তারা, ছায়াপথে তারার মেঘ। দেখছি, হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ এই দেখছে। দেখতে-দেখতে, বিজ্ঞানীদের আগে দার্শনিকের মাথায় প্রথম এই প্রশ্ন এল, এই জমি কার, এই আকাশ কার, গ্রহ, নক্ষত্র দিয়ে এই আকাশকে কে এমন করে সাজাল ! বিশাল-এর স্রষ্টা কে ? কে তা জানা যাচ্ছে না ! তখন একটা সম্ভ্রম জাগছে মনে। কে তুমি, আর বলতে পারছি না। সম্মান জানাতে ইচ্ছে করছে। কে আপনি ? বিশালের চেয়ে বিশালতর আপনি। বিশালতম। আপনি

মানুষ নন, ভগবান, ঈশ্বর ! 'ভগ' শব্দের অর্থ, ঐশ্বর্য। কী-কী সেই গুণ ! যার জন্যে তিনি ভগবান, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই সৃষ্টি তাঁর। বিজ্ঞানীর এলাকা তাঁর গবেষণাগার। তিনি কার্যের পেছনে কারণের অনুসন্ধান করতে চান। তাঁর কাছে জল শুধু জল নয়, দুই অণু হাইড্রোজেন, এক অণু অক্সিজেন। এর পেছনে আর যাওয়ার দরকার নেই। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এল কোথা থেকে ? এ-প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনে এসেছে অনেক অনেক পরে। আর সেই অনুসন্ধানেরই উত্তর : বিগ ব্যাং। সেকেন্ডকে একশো ভাগ করে তার একভাগ নাও। সৃষ্টি ধরো শুরু হচ্ছে। কিছু নেই, কেউ নেই। শূন্য মহাশূন্য। হঠাৎ এক বিস্ফোরণ। সময়ের শুরু। একের একশো সেকেন্ড। একটা বিস্ফোরণ নয়, একসঙ্গে অজস্র বিস্ফোরণ। ধরো গোলাকার এক মহাশূন্যের ওপরে, নীচে, এপাশে-ওপাশে একসঙ্গে অজস্র বিস্ফোরণ, বিগ ব্যাং। কালীপুজোর সময় একসঙ্গে অনেক পটকায় আগুন দিলে যা হয়। বস্তুকণা ভীমবেগে একটা থেকে আর-একটা ছিটকে-ছিটকে চলে যাচ্ছে। সেই একশো সেকেন্ড সময়ে বিশ্বের উত্তাপ একশো কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সবচেয়ে উত্তপ্ত তারার কেন্দ্রের উত্তাপের চেয়েও উত্তপ্ত সেই প্রাথমিক উত্তাপ। তোমার, আমার কল্পনার বাইরে। সেই ভয়ঙ্কর উত্তাপে বস্তু যা দিয়ে তৈরি, অণু, পরমাণু, এমনকী তার চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা ভেঙে চুরমার। কোনওটাই কোনওটার সঙ্গে সংলগ্ন নেই। বস্তুর এই অবস্থাকে আধুনিক হাই এনার্জি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পরিভাষায় বলা হচ্ছে, এলিমেন্টারি পার্টিকল্‌স। এই প্রাথমিক বস্তুকণার একটা জাত হল ইলেকট্রন, এর চার্জ হল নেগেটিভ। মাইনাস। বৈদ্যুতিক তারে এই ইলেকট্রনই প্রবাহিত হয়। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত অণু-পরমাণুর বাইরের দিকে এই ইলেকট্রনই সাজানো আছে। এর পরেই আসছে সমান আয়তনের আর-এক ধরনের পার্টিক্‌ল পজিট্রন। যার চার্জ হল পজেটিভ। সৃষ্টির আদিতে পজিট্রন আর ইলেকট্রন সমান সংখ্যায় ছিল। এখন আর তা নেই। এখন হাই-এনার্জি গবেষণাগারে পজিট্রন তৈরি করা হয়, কোনও-কোনও রেডিয়ো অ্যাক্টিভ পদার্থ থেকে পজিট্রন বেরিয়ে আসে। কস্‌মিক-রে ও সুপারনোভায় পজিট্রন পাওয়া যাবে। সৃষ্টির সেই আদি তাণ্ডবে আরও এক ধরনের পার্টিক্‌ল ছিল, যার নাম নিউট্রিনো। ভৌতিক বস্তুকণা, যার না আছে আয়তন, না আছে কোনও চার্জ। সেকেন্ড অর্থাৎ সময় যত এগোল, প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের পর বিচ্ছুরিত হল আলো। প্রচণ্ড আলো, ভয়ঙ্কর আলো। একালের কোয়ান্টাম থিয়োরি কী বলছে জানো, আলো আর বস্তুকণা আলাদা নয়, এক। আলো হল ফোটন। যার কোনও আয়তন নেই, বৈদ্যুতিক শক্তিও নেই। আমাদের এই ইলেকট্রিক বাল্‌বের দিকে তাকাও। একটা ফিলামেন্ট। বিদ্যুৎতরঙ্গ আসছে। ফিলামেন্টের এক-একটা অণু যে-মুহূর্তে উচ্চশক্তি হায়ার এনার্জি থেকে লোয়ার এনার্জিতে আসছে, সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসছে একটা ফোটন। এই ব্যাপারটা একের-পর-এক এত দ্রুত ঘটছে, যে সবসময় আমরা একটা স্থির আলো দেখতে পাচ্ছি। নিরবচ্ছিন্ন আলো। একমাত্র একটা ফোটো ইলেকট্রিক সেল একটা একটা করে এই ফোটন গুনে দিতে পারে।

"এদিকে সময় এগোচ্ছে, সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ, দু ভাগ, তিন ভাগ। প্রথম বিস্ফোরণের উত্তাপ কমছে। একের দশ সেকেন্ডে তিরিশ হাজার মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এক সেকেন্ড পরে দাঁড়াল দশ হাজার মিলিয়ন ডিগ্রি, চোদ্দ সেকেন্ড পরে দাঁড়াল, তিন হাজার মিলিয়ান ডিগ্রি। মনে করো বিশাল এক পাত্র, তার মধ্যে ভীষণ, ভীষণ গরম একটা স্যুপ। সেই অদ্ভুত স্যুপের নাম, বিজ্ঞানীদের ভাষায়, 'কসমিক স্যুপ'। এই স্যুপ থেকে বেরিয়ে আসবে আর কিছুক্ষণ পরেই— সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র। বেরিয়ে আসবে পৃথিবী, জয়, জয়া, উদয়ন, খড়ক, শিবশঙ্কর। চলো, আজকের মতো আমরা নিদ্রা যাই।" (ক্রমশ)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কেরিয়ার গাইড

ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে জয়েন্ট এনট্রান্স

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কলেজে এম.বি.বি.এস. কিংবা বি.ই. কোর্সে ভর্তি হতে হলে জয়েন্ট এনট্রান্সে বসতেই হবে। আর যাঁরা আই. আই. টি-র কোর্স সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁদেরও দিতে হবে আলাদা জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা। পরীক্ষা দেরিতে হলেও আবেদন করতে হবে এখনই।

বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে চিকিৎসক কিংবা এঞ্জিনিয়ার হতে চান। তাঁদের অভিভাবকরাও ১১ ক্লাসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে ছক কষে ফেলেন, কীভাবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবেন। তখন থেকেই শুরু হয় জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি। এই পরীক্ষায় সফল হতে পারলে মেডিক্যাল কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের একটি আসন পাওয়া সম্ভব হতে পারে। অনেক ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে এই ধরনের আরও কয়েকটি পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন করেন, যেমন, বি.আই.টি. (মেসরা), হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, দিল্লির এ.আই.আই.এম.এস, ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি।

জয়েন্ট এনট্রান্স

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা দুটি বড় ধরনের জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত। প্রথমটি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এগজামিনেশন ফর অ্যাডমিশন টু এঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রি কলেজেস পরিচালিত জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা। দ্বিতীয়টি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি পরিচালিত জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা। প্রথমে আমরা পশ্চিমবঙ্গের এঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথমেই জানাই, এইসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দামি আসনে ভর্তির জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এগজামিনেশন কর্তৃপক্ষ (ম্লাটার হল, বি.ই. কলেজ ক্যাম্পাস, হাওড়া-৭১১১০৩) পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং মেধা-তালিকা প্রস্তুত করে সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটির কাছে পাঠান। সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটি ছাত্রছাত্রীদের র‍্যাঙ্ক অনুসারে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির তালিকা প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফল অনুসারে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়, সেই বিষয়ে জানাচ্ছি। এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে কলেজগুলি হল: (১) বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া; (২) যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৩২; (৩) রিজিওনাল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর-৭১৩ ২০৯; (৪) জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি-৭৩৫ ১০১। টেকনোলজিক্যাল, কোর্সের ক্ষেত্রে: (১) কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর-৭৪২ ১০২ (মুর্শিদাবাদ); (২) কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর-৭১২ ২০১ (হুগলি); (৩) কলেজ অব সিরামিক টেকনোলজি, কলকাতা-৭০০ ০১০; (৪) কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, কলকাতা-৭০০ ০১৫।

এবার মেডিক্যাল কোর্সের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজগুলির নাম উল্লেখ করছি। (১) মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; (২) নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৭০০ ০১৪; (৩) আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৭০০ ০০৪; (৪) ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ,

এক নজরে জয়েন্ট এনট্রান্স

পরীক্ষার তারিখ: শনিবার ২৩ এপ্রিল '৯৪ ও রবিবার ২৪ এপ্রিল '৯৪।

পরীক্ষার বিষয়: ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি (এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে)। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি (ডাক্তারি কোর্সের ক্ষেত্রে)। ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি— উভয় (কম্বাইন্ড) পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে।

আবেদনপত্র: পাওয়া যাবে বিভিন্ন এঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ অফিস থেকে, ১০ টাকার বিনিময়ে।

আবেদন করার শেষ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, '৯৩।

কলকাতা-৭০০ ০১৪ ; (৫) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া-৭২২ ১০২ ; (৬) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪ ; (৭) নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, পোঃ সুশ্রুতনগর-৭৩৪ ৪৩২, দার্জিলিং।

ডেন্টাল কলেজগুলি হল : (১) ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজ, কলকাতা-৭০০ ০১৪ ; (২) নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ, পোঃ সুশ্রুতনগর-৭৩৪ ৪৩৮, দার্জিলিং।

পরীক্ষার বিষয়

জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ এবং ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৪। যেসব ছাত্রছাত্রী কেবলমাত্র এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য পরীক্ষা দেবেন তাঁদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। আর যেসব প্রার্থী কেবলমাত্র মেডিক্যাল কোর্সের জন্য পরীক্ষায় বসবেন, তাঁদের ফিজিকস্, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। যেসব প্রার্থী এঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল এই দুটি কোর্সের জন্যই পরীক্ষা দিতে চান, তাঁদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং বায়োলজি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা। তবে দুটি কোর্সের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৬০ টাকা জমা দিতে হবে।

যোগ্যতা

যেসব ছাত্রছাত্রী ১৯৯৪ সালে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স অথবা বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারবেন। অর্থাৎ, এই পরীক্ষায় বসতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল বিজ্ঞান বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীর জন্ম তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭-এর পরে হলে তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এ ছাড়া প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। উল্লিখিত বিভিন্ন কলেজের অফিস থেকে ১০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। পরীক্ষার ফি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলকাতা, হাওড়া ও বিভিন্ন জেলা শহরের শাখা অফিসে ব্যাঙ্ক চালানে জমা দেওয়া যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিড কার্ড, রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট এবং তপসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতিগত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে। আর.জি.কর ও নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ ছাড়া অন্য সব মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়া যাবে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর।

পরামর্শ

উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অব এগজামিনেশনের জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। সেজন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে-সঙ্গে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতিও হয়ে যাবে। তবে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হলে সব বিষয় খুঁটিয়ে পড়া দরকার, প্রবলেম ও থিয়োরি দুটি বিষয়েই জোর দিতে হবে। সম্ভাব্য প্রশ্নের ধরনধারণ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। প্রসঙ্গত জানাই, অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল এনট্রান্স পরীক্ষায়ও বসতে হবে, কেননা শতকরা ১৫টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় এই পরীক্ষার ভিত্তিতে। এই পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে সি.বি.এস.ই-র অনুমোদিত বই অনেকটা সাহায্য করে।

আই.আই.টি : জয়েন্ট এনট্রান্স

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বোম্বাই, দিল্লি, কানপুর, খড়্গপুর, মাদ্রাজ কেন্দ্রের যে-কোনও একটিতে ভর্তির জন্য আই.আই.টি. কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে জয়েন্ট এনট্রাস পরীক্ষা নেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তির পরীক্ষা একই সঙ্গে নেওয়া হয়। ১৯৯৪-'৯৫ শিক্ষাবর্ষে এইসব ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৫ ও ৬ মে, ১৯৯৪ তারিখে।

যোগ্যতা

যেসব প্রার্থী ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বিষয় নিয়ে ১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। '৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যেসব প্রার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাবনা আছে, তাঁরাও এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে যেসব প্রার্থীর জন্ম তারিখ ১ অক্টোবর, ১৯৭৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮-এর মধ্যে, তাঁরা নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স পাঁচ বছর শিথিল করা হবে। এ ছাড়া

এক নজরে আই. আই. টি. জয়েন্ট এনট্রান্স

পরীক্ষার তারিখ : ৫ ও ৬ মে ১৯৯৪ সাল।
যোগ্যতা : কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স সহ ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ।
তথ্য পুস্তিকা ও আবেদনপত্র : কানাড়া ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট শাখা থেকে অথবা ডাকযোগে আই.আই.টি. খড়্গপুর অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
বিনিময় মূল্য : ২৭৫ টাকা (তফসিলি ক্ষেত্রে ১১০ টাকা)।
শেষ দিন : ডাকযোগে ফর্ম সংগ্রহ ৫ জানুয়ারি, '৯৪। কাউন্টার থেকে ফর্ম সংগ্রহ ১৭ জানুয়ারি '৯৪। জমা দেওয়ার তারিখ ২০ জানুয়ারি '৯৪।

ছবি : দেবাশিস দেব

তাঁদের জন্য আইনানুগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বিভিন্ন কোর্স

এবার জানা দরকার কোন-কোন কোর্সে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। বি. টেক, বি. ফার্ম, বি. আর্ক, ইনটিগ্রেটেড এম. এসসি, ইনটিগ্রেটেড এম. টেক, কো-অপারেটিভ ইনটিগ্রেটেড এম. টেক ইত্যাদি বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা। মনে রাখতে হবে, আই. আই. টি-র যে-কোনও ইনস্টিটিউটের এইসব কোর্সে ভর্তি হলে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে সফল হতে হবে।

মেধা তালিকা

জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন আই. আই. টি.-তে ভর্তির জন্য প্রতিটি ক্যাটিগরির আলাদাভাবে মেধা-তালিকা তৈরি করা হবে। এই মূল মেধা-তালিকার অন্তর্ভূত প্রার্থীদের কেবলমাত্র ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়া আলাদাভাবে একটি 'এক্সটেন্ডেট মেরিট লিস্ট' তৈরি করা হবে। এই তালিকার অন্তর্ভূত ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে 'র‍্যাঙ্ক সার্টিফিকেট' পেতে পারবেন। এই অতিরিক্ত মেধা-তালিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের শিক্ষায়তনে ভর্তির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন, সেজন্যই এটি প্রকাশ করা হবে (পরীক্ষামূলকভাবে)।

কীভাবে আবেদন করবেন

কানাড়া ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখা থেকে ২৭৫ টাকার বিনিময়ে 'অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম' ও 'ইনফরমেশন বুকলেট' সংগ্রহ করা যাবে। এই টাকার অঙ্কের মধ্যেই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি ধরা আছে। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাউন্টার ফয়েলটি গেঁথে দিতে হবে। তফসিলি প্রার্থীরা ১১০ টাকার বিনিময়ে এটি সংগ্রহ করতে পারবেন। এবার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধের জন্য কয়েকটি শাখা-অফিসের নাম উল্লেখ করছি। যেমন, অসম— বরপেটা, দিসপুর, গুয়াহাটি (ফ্যান্সিবাজার), যোরহাট, কাছাড়, তিনসুকিয়া ইত্যাদি ; বিহার— ভাগলপুর, বোকারো, চাইবাসা, দ্বারভাঙা, ধানবাদ, গয়া, হাজারিবাগ, পূর্ণিয়া, রাঁচি ইত্যাদি ; ওড়িশা— বারিপদা, বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী, রউরকেলা, সম্বলপুর ; ত্রিপুরা— আগরতলা ; পশ্চিমবঙ্গ— আসানসোল, বর্ধমান, আলিপুর, ব্রেবোর্ন রোড, ভবানীপুর, চৌরঙ্গি, কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, যাদবপুর, শিয়ালদহ, দুর্গাপুর, হাওড়া, খড়্গপুর, পুরুলিয়া, কাকুড়িয়া (ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ), ট্যাংরা (বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা) ইত্যাদি শাখা-অফিসে ফর্ম পাওয়া যাবে।

ডাকযোগে ফর্ম সংগ্রহ করতে হলে প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা ৫×১০ সে.মি. মাপের দুটি স্লিপ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি খড়্গপুর-কে প্রদেয় ২৭৫ টাকার (তফসিলি ক্ষেত্রে ১১০ টাকার) একটি অ্যাকাউন্টপেয়ি ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হবে। পাঠানোর ঠিকানা : The Chairman, JEE, IIT Kharagpur-721302. ডাকযোগে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে ৫ জানুয়ারি, '৯৪ তারিখ পর্যন্ত। বিভিন্ন কাউন্টার থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। মনে রাখতে হবে, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, '৯৪।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ

বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি ভর্তি হওয়ার বিশেষ সুযোগ আছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে, Organising Chairman, Undergraduate Admissions Committee, JEE Office, Indian Institute of Technology, Kanpur-208 016,U.P., India ঠিকানায়।

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান

"ম্যাজিক দেখাবার সময় জাদুকর যতই ছড়ার মন্ত্র আওড়ান আর অঙ্গভঙ্গি করুন, আধুনিক ম্যাজিক আসলে হাতসাফাই। কিন্তু এই হাতসাফাই-এর মজাটা করতে হয় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে। আজকের জাদু আসলে বিজ্ঞানেরই একটি শাখা।" স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে কথাগুলো বলছিলেন জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়ার)।

সম্প্রতি পার্ক সার্কাসের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদের হলে জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও মেঘনাদ সাহা স্মরণ অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়ার) বলেন, "ম্যাজিকের সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।"

উদ্বোধনী ভাষণে কলকাতার শেরিফ অনুতোষ দত্ত দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার ওপরও জোর দেওয়ার আবেদন জানান। পরিবেশ বাঁচাতে ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে রয়েছে কয়েক শতাব্দীর শত-শত বিজ্ঞানীর সাধনা। বিশেষ অতিথি সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই পিতামহ বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে স্মরণ করেন।

স্বামী অমেয়ানন্দ মহারাজ কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে ১৪৮টি কেন্দ্রে জাতীয় বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষার আয়োজন করেছিল। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত এই পরীক্ষায় প্রতি শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারীদের দেওয়া হয় রৌপ্য পদক, এবং প্রতি কেন্দ্রের প্রথমজনকে দেওয়া হয় বিজ্ঞানের বই। পরিষদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা সভায় বিস্তৃতভাবে জানান অধিকর্তা মনোজ দত্ত। মেঘনাদ সাহাকে স্মরণ করতে গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান ডি. কে. সিন্‌হা। সভাপতির ভাষণে স্বামী অমেয়ানন্দ মহারাজ জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রশংসা করেন।

সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

জিনা যখন ইতালিতে

এক দুরন্ত ফুটফুটে কিশোরী জিনা জ্যারি ইতালিতে গেল ইয়ো ইয়ো প্রতিযোগিতার জন্য। এই যাত্রাটা তার কাছে শুধু প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বা একটা নতুন দেশ দেখা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। সে যেমন সেখানে তার ঠাকুমার জন্য কিছু একটা রহস্যময় কাজ করেছিল, তেমনই সে অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল যখন সে স্তেফান নামে এক চিন্তাশীল, সুন্দর ডাচ যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। আবার একই সঙ্গে জিনা জারি ভ্রমণের অপ্রত্যাশিত বিপদ ও আনন্দ উপভোগ করেছিল। এবং তার কাছ থেকে সে জীবনে অনেক শিক্ষাও নিয়েছিল। 'শুট ফর দ্য মুন' বলে এই গল্পে নোরমা হাওয়ে এক কিশোরীর বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। ১৯ ডলারের বইটি প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের ক্রাউন বুক।

শখের বই

'শখের বই'। নামটা শুনে একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে, তাই না ? ব্যাপারটা তা হলে একটু খুলেই বলি। শিশুরা তাদের মানসিক বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কোনও-না-কোনও ব্যাপারে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, সেটা মাছ ধরা থেকে ফোটো তোলা যে-কোনও ব্যাপারেই হতে পারে। কিন্তু আমরা বড়রা তাদের সেই হবিটাকে ঠিকভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে চালনা করতে পারি না বলেই শিশুদের এই শখ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে 'হবি হ্যান্ড বুক' বইটিকে বাস্তবসম্মত পথনির্দেশিকা বলা যেতে পারে। এই সিরিজের দুটি বই 'বার্ড ওয়াচিং' এবং 'স্ট্যাম্পস'।

অনেকেরই হবি ডাকটিকিট জমানো। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে না জমিয়ে অনেকেই নানা দেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করে একটা খাতায় আটকে রাখে। তারপর একসময় অযত্ন আর অবহেলায় হারিয়ে যায় সেই ডাকটিকিটের খাতা। আকর্ষক এই বইটি পড়লে জানা যাবে এই হবির উদ্দেশ্য, কীভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায়, কীভাবেই বা অন্যদের কাছে তুলে ধরা যায় সেই জমানো ডাকটিকিট, কীভাবে লিখে সাজাতে হয় সূচিপত্র, ইত্যাদি। একজন নতুন ডাকটিকিট সংগ্রাহক জানতে পারবে কীভাবে ডাকটিকিট ডিজাইন করা হয় ও ছাপা হয়, কী করে চেনা যায় আসল এবং নকল টিকিট। নিজেদের ডাকটিকিটের পরিবর্তে অন্য কারও ডাকটিকিট কীভাবে পাওয়া যাবে, সে-তথ্যও জানা যাবে বইটি পড়লে। ঝকঝকে ছাপা এবং চমৎকার সব ছবিতে ভরা এই সুন্দর বইটি লিখেছেন মাইকেল ব্রিগ্‌স। দাম মাত্র ১৩ ডলার।

পাখি দেখা, এও এক হবি। কিন্তু নিজেকে পক্ষিবিশারদ বললেই শুধু হল না, জানতে হবে অনেক কিছু। রব হউম-এর লেখা নানা জাতের পাখির ছবিতে সাজানো এই বইটি পড়লে জানতে পারা যায় কীভাবে চেনা যায় আলাদা-আলাদা প্রজাতির পাখি, কীভাবেই বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দূরবিনের সাহায্যে পাখি দেখা হয় এবং আছে পাখি সম্পর্কে নানা চমকপ্রদ তথ্য—যা উৎসাহীদের খুব কাজে লাগবে। কাজের তুলনায় দাম কিন্তু মোটেই বেশি নয়, মাত্র ১৩ ডলার। বইটির প্রকাশক র‍্যানডম হাউস।

ছড়া পড়তে মজা

ব্যাঙের ঠ্যাং ড্যা ড্যাং ড্যাং
সুধীরকুমার দে
প্রকাশক : সুদেষ্ণা দাস
দাম : ১০ টাকা

ছড়া কে না ভালবাসে ? ছড়া পড়তেও মজা। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' কিংবা

'ইকির মিকির চাম চিকির' ছড়ার মজা আমাদের রক্তে মিশে গেছে। একরকমের ছড়া আছে ; যেখানে ছড়াকার কিছু বলতে চান না, তার কোনও মানেও হয়তো নেই। শুধু শব্দ আর ছন্দ মিলে যে মজা ছড়ায় তৈরি হয়, সেইটুকুই পাঠকের মনে বা শ্রোতার কানে পৌঁছে দিতে চান ছড়াকার। এইসব ছড়ার মধ্যেও মিশে থাকে এক কল্পনার জগৎ। সুধীরকুমার দে'র লেখা 'ব্যাঙের ঠ্যাং ড্যা ড্যাং ড্যাং' এরকমই একটি ছড়ার বই ; এই রকমই ৩৯টি ছড়া আছে এই বইটিতে।

রহস্য গল্প

জেগেছে রামাপিথেকাস
অশোক সেনগুপ্ত
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম : ১৬ টাকা

এই বইয়ের চারটি গল্পে রহস্যের ছোঁয়া আছে ; আর আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য। তার মানে, গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক তোমাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচয় করাতে চেয়েছেন। রামাপিথেকাসের ফসিল চুরির সমাধানের সঙ্গে-সঙ্গে জানা হয়ে যাবে হোমোস্যাপিয়েন্সের আগে বনমানুষ ও মানুষের মাপের স্তরগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য ; গল্পে-গল্পে জেনে নেওয়া যাবে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার উপাদান কিংবা ইউফো নিয়ে বিতর্কের বিষয়টি।

স্বপন রায়চৌধুরী

জঙ্গলের জীবন্ত ছবি

অরণ্যপরিবেশ এবং জীবজন্তুরা চোখের সামনে হাজির হয় যে বইটি পড়তে-পড়তে, তার নাম 'সাফারি আ লিফট-দ্য-ফ্ল্যাপ্‌স অ্যাডভেঞ্চার'। বইটির লেখক জেন গ্যাস্টোন। আফ্রিকার সমস্ত জীবজন্তুকে সাজানো হয়েছে সুন্দরভাবে। ফলে বইটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যদিও ছোটদের জন্য লেখা, কিন্তু উপস্থাপনার গুণে বইটি বড়দেরও ভাল লাগবে। রঙিন, চমকপ্রদ ছবিতে ভরা এই বইটি পড়তে-পড়তে ছোটরা যেন চোখের সামনেই দেখতে পাবে চিতাবাঘ কীভাবে তার শিকারকে তাড়া করে ধরে, কিংবা একটা গণ্ডার কীভাবে পশুরাজ সিংহ দেখে ভয় পায়, কিংবা কীভাবে একটা জিরাফ তার লম্বা গলাটা বাঁকিয়ে একটা গর্ত থেকে জল খায়—এইরকম নানা আশ্চর্য দৃশ্য। এ ছাড়াও বইটিতে আছে বহু বিস্ময়কর তথ্য। ২৪ পাতার এই বইটির দাম মাত্র আট ডলার। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের র‍্যানডম হাউস।

ছোট-বড় সকলের ভাল লাগবে বইটি।

কাজল চক্রবর্তী

ছবি : দেবাশিস দেব

নানারকম

ধাঁধা

সেজদাদু আর ছোট্‌কা একসঙ্গে হলে অনেক মজার-মজার কথা শোনা যায়। যেমন আজ সকালেই দারুণ মজার একটা কথা শুনলাম। অবশ্য কথাটাই মজার শুধু ছিল না, সকালের চায়ের আসরটাও ছিল খুব জমাটি। ছোড়দি কেক তৈরি করেছিল বাড়িতে। দুর্দান্ত স্বাদের কেক। সেই কেক খেতে-খেতে সেজদাদু ছোট্‌কার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাঙালিরা দিব্য আছে। পুজোয় হিন্দু, বড়দিনে ক্রিশ্চান।"

"কেন?" ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেন বাবা।

"এই-যে কেক। এ তো বড়দিনের খাবার। তো, বাঙালি বাড়িতে এখন বড়দিনে কেক চাই-ই চাই। পুজোয় চাই এবেলা-ওবেলা নানা পদের খাবার, বিজয়ার মিষ্টি, লক্ষ্মীপুজোয় নাড়ু। আবার যেই না বড়দিন এল, অমনই কেক বানানো শুরু

হয়ে গেল। যে বানাতে জানে না, সেও দোকান থেকে কিনে খাবে।" সেজদাদু প্রায় লেকচার দেওয়ার ধরনে বলে গেলেন।

ছোট্‌কা এতক্ষণে মুখ খুলল। খুব শান্ত গলায় বলল, "যাই বলো, কেকটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। আর বাঙালির কথা বলছ? যুগটার কথা ভেবেছ?"

"যুগ? কীসের যুগ?" সেজদাদু পালটা প্রশ্ন করলেন।

ছোট্‌কা বলল, "হুজুগের। আরে বাবা, হুজুগ আছে বলেই না এখন বড়দিনে যেমন কেক খায় বাঙালিরা, পৌষপার্বণে তেমনই পিঠে-পুলি-পায়েস!"

একটু থেমে ছোট্‌কা গলায় দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলল, "সুতরাং হুজুগ যুগ-যুগ জিয়ো।"

সেজদাদু যে মজা করছিলেন, সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। একগাদা টাকা ব্যাগ থেকে বের করে ছোট্‌কার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

এ-টাকা আমাদের ছোট চারজনের বড়দিনের পার্বণী। ভাগ্যিস, ছোড়দি জব্বর বানিয়েছিল কেকটা!

সেজদাদু টাকা দিলেন। আর ছোট্‌কা সেই টাকা তো দিলই, সেইসঙ্গে দিল একটা চমৎকার ধাঁধা। তোমরা ধাঁধাটাই নাও।

প্রথম ধাঁধা ॥ ১৬টা মুখ আঁটা খাম। ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া রয়েছে খামগুলোর ওপরে। যে-খামের ওপর যত নম্বর লেখা, সেই খামের ভেতরেও রয়েছে ঠিক সেই পরিমাণ টাকা। এবার, খামগুলো না খুলে, শুধু নম্বর দেখে-দেখেই, চারজনের মধ্যে, প্রত্যেককে চারটে করে খাম ধরিয়ে, টাকাগুলো সমান চারভাগে ভাগ করে দিতে হবে। চারজন প্রাপকের কে কোন খাম পাবে, খুব তাড়াতাড়ি হিসেব করে বলতে পারো?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন সবজি মাঝেমধ্যে প্রতিবন্ধী?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পলাকাগোঠ

গতবারের উত্তর ॥ (১) অন্যদিনের বিক্রি টাকার চেয়ে এক টাকা ২০ পয়সা কম হবে সেদিন। কারণ, ৬০ পয়সা জোড়ার একটা কলার বিক্রি-দাম দাঁড়ায় ৩০ পয়সা, ৬০ পয়সায় তিনটের ক্ষেত্রে একটার বিক্রি মূল্য ২০ পয়সা। অর্থাৎ মিলিয়ে, ৫০ পয়সায় দুটো কলা। গড়ে প্রতি কলা বিক্রি হয় ২৫ পয়সায়। সেদিন কিন্তু এক টাকা ২০ পয়সায় বিক্রি হয়েছে পাঁচটি কলা। গড়ে প্রতি কলার বিক্রি দাম ২৪ পয়সা। প্রতি কলায় সুতরাং এক পয়সা করে লোকসান। ১২০টি কলায় লোকসান তাই এক টাকা ২০ পয়সা। (২) কর্ণাটিকে। (৩) মকরকেতন।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

বাতিল লুডোর গুটি নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে তোমাদের? ছ'টা এক রঙের গুটি জোগাড় করে রাখো। হাতের সামনে যদি লুডোর গুটি না থাকে, কোনও পরোয়া কোরো না। ছ'টা ১০ পয়সা এক জায়গায় রেখে দাও।

এবার একটা কাগজ নাও। কাগজটার ওপরে ছ'লাইনের এবং ৩৬ ঘরের একটা ছক এঁকে ফ্যালো। ঠিক ১ নং ছবিতে যেমন দেখানো আছে, তেমন হবে ৩৬ ঘরের খোপ-কাটা ছকটা। ব্যস, খেলা তৈরি। এবার কী করতে হবে শোনো। অর্থাৎ খেলাটা

১ নং ছবি

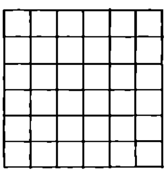

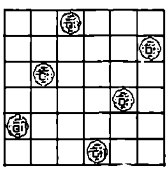

২ নং ছবি

কী, জেনে নাও।

ছ'টা গুটি বা পয়সাকে এই ছকটার নানান ঘরে এমনভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে বসাতে হবে, যাতে কিনা— এক ঘরে দুটো পয়সা বা গুটি না বসে, এবং আড়াআড়ি, লম্বালম্বি বা কোনাকুনি— কোনওদিক থেকেই একটা পয়সা অন্য কোনও পয়সার সঙ্গে অথবা একটা গুটি অন্য কোনও গুটির সঙ্গে এক লাইনে না পড়ে। এলোমেলোভাবে পয়সা বসাতে গেলেই বুঝবে, শর্ত মিলিয়ে এ-খেলার সমাধান কত কঠিন! বন্ধুরাও পারবে না। খুব হিসেব করে বসাতে হবে। কীভাবে? ২ নং ছবিতে দেখে নাও।

মজারু

ভাবতে-ভাবতে

অনেক লেখকই বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। যেমন, গৌরকিশোর ঘোষের ছদ্মনাম 'রূপদর্শী', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম, 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক' ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম-এর ব্যবহার অনেক দিন আগে থেকেই চলে আসছে। আমাদের অনেক স্মরণীয় লেখক আবার ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন মহিলার নামে। আমাদের এবারের

ভাবতে-ভাবতে এই ছদ্মনাম সম্পর্কে। আমি কয়েকটি ছদ্মনাম তুলে দিলাম, ভেবে বলতে হবে কোন নামটি কোন লেখকের।

১ ॥ নীহারিকা দেবী কার ছদ্মনাম?

২ ॥ সুনন্দ কার ছদ্মনাম?

৩ ॥ অনিলা দেবী কার ছদ্মনাম?

৪ ॥ ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম?

৫ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী কার ছদ্মনাম?

৬ ॥ সুপান্থ কার ছদ্মনাম?

উত্তর : (১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। (২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। (৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৫) অরুণ রায়। (৬) সুবোধ ঘোষ।

বর্ণপ্রিয়

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

চাকুম্ চুকুম্ এলো রসনার স্প্রেড মেকার।

স্বাদেও নতুন খেতেও দারুণ।

রসনা স্প্রেড। **কী দারুণ খেতে।** একেবারে জ্যামের মত, দেখতে জ্যামের মত। গন্ধেও তাই। পাঁউরুটি, বিস্কুটের সাথে মাখিয়ে ছোটরা খায় গপাগপ্। ভালবাসে রুটি, পরোটা ও লুচির সাথে। **একদম সহজে তৈরী।** মাত্র কয়েক মিনিটেই তৈরী করতে পারবেন, — তিনটি রসালো স্বাদে যেমন মিক্সড্ ফ্রুট, পাইনেপ্ল এবং অরেঞ্জ। **আর দামও কম।** এক প্যাক রসনা স্প্রেড মেকারের দাম মাত্র ১১.৭৫ টাকা আর এক প্যাকে পাবেন ৫০০ গ্রাম স্প্রেড। রসনা স্প্রেড। **জ্যামের মত খেতে ভাল দাম কিন্তু অর্দ্ধেক।**

রসনা স্প্রেড বানাবার সহজ নিয়ম

এক রসনা স্প্রেড মেকার কাপ ভর্তি জল নিয়ে গরম করুন এবং তাতে রসনা স্প্রেড মেকার পাউডার মেশান।

এরপর এতে দুই রসনা স্প্রেড মেকার কাপ ভর্তি চিনি মিশিয়ে নাড়তে থাকুন।

আরও কয়েক মিনিট ফুটিয়ে আঁচ (আগুন) থেকে নামিয়ে দিন।

এবার এতে রসনা স্প্রেডমেকার লিকুইড মিশিয়ে নেড়ে দিন।

মিশ্রণটিকে বড় মুখের পরিষ্কার বোতলে ঢেলে ৪ ঘণ্টা (চার) জমতে দিন। রসনা স্প্রেড তৈরী

Mudra:EAMR:6890 Ben

ANANDAMELA 22 DECEMBER 1993 REGD. NO
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-686 TN/MS(C)731